ভেসে চলা।

সিন্ধু—ঠুংরি।

অসীম সাগরে চলেছি ভাসিয়া
হৃদয় মাঝারে তোমারে ধরিয়া—
তোমারি গাহিয়া গান।
তোমারি পান
জাগায়ে প্রাণ
উঠুক শতেক তান—
দুঃখ-শোক অবসান॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্থর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ ° ১´ ° ॥
II পা পা পা রা। পা -া মপধা ণর্সা I ণা ধা পা মা। মমা জ্ঞজ্ঞা রা -া I
অ সী ম সা গ ০রে০০ ০০ চ লে ছি ভা সি০ ০০ য়া ০

১´ ° ১´ °
I ণ্া ণ্া রা রা। রা রা সরজ্ঞা মপা I পা মা মজ্ঞা রজ্ঞা। জ্ঞা রা সা -া I
হৃ দ ০ য় মা ঝা রে০০ ০০ তো মা রে০ ০০ ধ রি য়া ০

১´ ° ১´ °
I সা সা -র্সা র্সা। র্সণা -ধণা ধা পা I মমা -পধা -ণর্সা -ণধা। -পমা -জ্ঞরা -সণ্া সা II
তো মা ০ রি গা০ ০০ হি য়া গা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ন্

১´ ° ১´ °
II মা -া পা ধা। না -া র্সা -া I নর্সা -র্রজ্ঞা র্রা র্সা। ধা -র্সা ণা -া I
তো ০ মা রি পা ০ ০ ন্ জা০ ০০ গা য়ে প্রা ০ ০ ণ্

১´ ° ১´ °
I ণধা -পমা পা ধা। না -র্সা -র্রর্রা র্সর্সা I নর্সর্রা -জ্ঞর্মা জ্ঞা র্রা। র্সনা -র্সা -ণধপা -মমা I
তো০ ০০ মা রি পা ০ ০০ ০ন্ জা০০ ০০ গা য়ে প্রা০ ০ ০০০ ০ণ্

১´ ° ১´ °
I পা পা -র্সা র্সা। ণধা পা পমা -জ্ঞরা I পা -া -া -া। -া -া -া -া I
উ ঠু ০ ক শ০ তে ক০ ০০ তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

১´ ° ১´ °
I র্সা -া র্সা র্রা। র্সর্সা -ণনা ধা পা। মমা -পধা -ণর্সা -ণধা। -পমা -জ্ঞরা -সণ্া সা II II
দুঃ ০ খ শো ক০ ০০ অ ব সা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ন্

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

নিরন্তর ভাব তাঁরে বিশ্বাধার বল যাঁরে।
নিত্য সত্য পরিপূর্ণ ব্যাপ্ত বিভু চরাচরে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে নাহি পায় ধ্যান ধরে,
স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ, বেদে কহে বারে বারে।
বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে পারি,
যত দেখ সব তাঁরি, কে তাঁরে বলিতে পারে॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুর—৺বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(আস্থায়ী)

১ ২´ ৩ ০
পা II পা নধা -নর্সা র্সা। র্রা র্সা -া -র্সধা। -পপা -মা পা মা। -গা -গা -া গা।
নি র স্ত• •• র ভা ব • •• •• • তাঁ রে • • • • বি

১ ২´ ৩ ০
। মা পা মা -া। গা গা -া -া। রা রগা রা া। সঃ সঃ -া -া সা।
শ্বা ধা র • ব ল • • • যাঁ রে • • • • • নি

১ ২´ ৩ ০
। সা গমা গমা রা। গা পা -া -া। -া ধা না -া। পা -া -া পা।
ত্য স• •• ত্য প রি • • • পূ র্ণ • • • • ব্যা

১ ২´ ৩ ০
। পা ধনা র্সর্রা র্সা। র্সা র্সা না র্সধা। ধনা র্সর্রা র্সাঃ র্সঃ। -ধনা -ধনা -পা পা II
প্ত বি• •• ভু চ রা • •• চ• •• রে •• •• •• • "নি"

(অন্তরা)

১ ২´ ৩ ০
পা II পা নধা নর্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সা।
(১) যো গী ন্দ্র• •• মু নী ন্দ্র • • • যাঁ রে • • • • না
(২) বু দ্ধি তে• •• বু ঝি তে • • • না রি • • • • বা

১ ২´ ৩ ০
। র্সা র্রার্গা র্রা। র্রা র্সা -া -া। -া র্সা নর্সা নর্সা। ধা না -া পা।
(১) হি পা য় • ধ্যা ন • • • ধ রে• •• • • • স্ব
(২) ক্যে না ক হি তে • • • পা রি• •• • • • য

১ ২´ ৩ ০
। পা গা মা রা। গা -া -া পা। -া ধা না -া। পা -া -া পা।
(১) প্র কা • শ স্ব • • স্ব • রূ প • • • • বে
(২) ত দে • থ স • • ব • তাঁ রি • • • • কে

১ ২´ ৩ ০
। পা ধনা র্সর্রা র্সা। র্সা র্সা -া -া। নর্সা নর্সা ধা না। পা গা রা II
(১) দে ক• •• হে বা রে • • বা• •• রে • • • •
(২) তাঁ রে• •• ব লি তে • • পা• •• রে • • • •

—•—

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

আগম নিগম বেদে\
করে যাঁরে অন্বেষণ\
যুক্তির অগম্য তিনি\
ভক্তিতে কর সাধন।\
রবি শশী তারা যাঁরে\
প্রকাশিতে নাহি পারে\
করিতে পারে কি কভু\
ক্ষণপ্রভ হুতাশন।

সেই বিভু স্বপ্রকাশ\
আত্মাতে তাঁহার বাস\
হও রে অন্তরে মগন।\
হৃদয়ের খোল দ্বার\
দূর হবে অন্ধকার\
প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে\
পাবে তাঁর দরশন॥ *

কথা—৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীলালবিহারী বড়াল\
ও শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩\
II সা সা। সা -মা গা। পা ক্মা। পা -া পা I পক্মা পা। ধা -া পক্মা।\
আ গ ম ০ নি গ ম বে ০ দে ক০ রে যাঁ ০ রে০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১\
। পক্মা ধা। পা -মা মা। মা মা। মা -ধা পা। মা মা। রা -া সা I\
অ০ ন্বে ষ ০ ণ যু ক্তি র ০ অ গ ম্য তি ০ নি

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩\
I সা সা। মা -া গা। পাঃ -ক্মাঃ। পা -া পা I ক্মপা -ধনা। -ধপা -া -া।\
ভ ক্তি তে ০ ক র ০ সা ০ ধ ন০ ০০ ০০ ০ ০

০ ১\
। -মা -মা। -রা -া -সা II\
০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩\
II { পা পা। নধা -া র্সা। র্সা র্সনা। র্রা র্সা -া I র্সা ধা। র্সা -া^ন র্রা।\
র বি০ শ০ ০ শী তা রা০ যাঁ রে ০ প্র কা শি ০ তে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১\
। র্সা না। র্সা ধা -নপা } I মা মা। মা -ধপা পা। মা মা। রা -া সা I\
না হি পা রে ০০ ক রি তে ০০ পা রে কি ক ০ ভু

২´ ৩ ০ ১\
I সা সা। মগা পা পা। না ধা। পা -মা মা II\
ক্ষ ণ প্র০ ০ ভ হু তা শ ০ ন

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩\
II সা সা। মা -া মা। মা গা। পা -া পা I পক্মা পা। ধা -া পা।\
সে ই বি ০ ভু স্ব প্র কা ০ শ আ০ ত্মা তে ০ তাঁ

* জ্যোতিদাদা বহুদূরে থাকিয়াও আমাদের 'পরমার্থ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের' সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেন ও তাঁহার রচিত গান সময়ে সময়ে পাঠাইতেন। এই গানটিও তাঁহারই প্রেরিত। শ্রীলালবিহারী বড়াল।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| ম্ঝা মা | রা -া সা I সা -া | মা -া গা | পা -ক্ষা | পক্ষা -ধা পা II
হা র বা ০ স হও ০ রে ০ অন্ ত রে ম ০ ০ গন্

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II { পা পা | নধা -ান র্সা | র্রা র্সা | র্সা -া -া I র্সা ধা | র্সা -না র্রা |
হৃ দ য়ে ০ ০ র খো ল দ্বার্ ০ ০ দূ র হ বে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা না | র্সা -ধা -নপা } I মা মা | মা -ধা পা | মা মা | রা -া সা I
অ ন্ধ কা র ০ ০ প্রে ম র ০ বির্ অ ভ্যু দ ০ য়ে

২´ ৩ ০ ১
I সা সা | মগা -পা পা | না ধা | পা -মা মা II II
পা বে তাঁ ০ ০ র দ র শ ০ ন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব—ঘরে ও বাহিরে। 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' প্রকাশের পর বাঙ্গালার পাঠকসমাজে নাট্যকাররূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। গৃহের বাহিরে তৎকালে তাঁহার যে অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, গৃহের ভিতরে যে তাহা সহস্রগুণে প্রবল ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনায়, প্রাণোন্মাদিনী সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সুর-তরঙ্গে তখন তাঁহাদিগের গৃহ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত ও প্লাবিত থাকিত এবং সেই অপরিসীম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া তাহার অধিকারী কত নবীন হৃদয়ে তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়া সেই স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়গুলিকে বিকশিত করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবসর কালে পরিবারস্থ মহিলাগণকেও একত্র করিয়া ইংরাজি গ্রন্থ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন এবং ইহার ফলে ইহাদের মধ্যেও সাহিত্যসেবাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয় ও তাঁহার অন্যতমা ভগিনী, সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন—"সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিন জন—অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চ্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গী পাইলাম।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সহায়তা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে তাহা এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে :—

"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চ্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতি দাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না। *

"তিনি আমাকে খুব একটা বড় রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সে জন্য হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে যেমন বর্ষার প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনূ্যন বারো বৎসরের বড় ছিলেন।

একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবল পক্ষেরা সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে—কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাত নিবারণের পন্থাতেই পৌছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা পীড়নের দ্বারা কাণ-মলা এবং কাণে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভাল-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না, ভাল করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই—ধর্ম্মনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্যুনিটিভ পুলিশের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মত বালাই জগতে আর কিছুই নাই।

"এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয় বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিল।"

'ভারতী'। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে হইবে। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথই উহার নামকরণ করিলেন "ভারতী"। দ্বিজেন্দ্রনাথ "ভারতী"র সম্পাদক বলিয়া বিঘোষিত হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এই মাসিক পত্রের সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের ভিতরে ছিলেন। এই মাসিক পত্রখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া কিরূপে বাঙ্গালার পাঠকসমাজের জ্ঞান ও আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কত সুচিন্তিত সন্দর্ভ, কত রসরচনা, কত বিদেশীয় গল্প প্রভৃতির অনুবাদ এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার অনেকগুলি রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেকগুলি সংগৃহীত হয় নাই। প্রথম বর্ষের 'ভারতীতে' প্রকাশিত ডাক্তার বাল্মীকির 'রামিয়াড' অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। এরূপ রসরচনা বাঙ্গালা ভাষায় তৎকালে অল্পই প্রকাশিত হইয়াছিল।

"এমন কর্ম্ম আর করবো না।" 'ভারতী' যে বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বৎসরেই, অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা আষাঢ়, ১৭৯৯ শক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে আর একটি অপূর্ব্ব রত্ন দান করিলেন। পরে "অলীক বাবু" নামে পুনর্মুদ্রিত "এমন কর্ম্ম আর করব না" নামক প্রহসন বাঙ্গালা সাহিত্যে যথার্থই অদ্বিতীয়। পূর্ব্বগামীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রহসন লিখিয়া বঙ্গবাসীকে হাসাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থের কোনও কোনও স্থান অশ্লীলতাদোষ-দুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থে কেবল "নির্ম্মল শুভ্র সংযত (?) হাস্যরস।"

প্রহসনের আখ্যান-ভাগ সংক্ষেপে এই:—অলীক প্রকাশ বাবু, সেক্সপীয়র-কৃত 'ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী' নামক নভেল, বায়রণ-কৃত 'চেম্বর্স অ্যাটলাস', কালিদাস-কৃত 'মুগ্ধবোধাদি' পাঠসমাপনে অশেষ বিদ্যোপার্জ্জনান্তর বিক্রমাদিত্য-বংশাবতংস কামাখ্যাধিপতির কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কৃষ্ণনগরনিবাসী সত্যসিন্ধু বাবুর বঙ্কিমি নভেলে দীক্ষিতা অনির্দ্দিষ্ট ভাবী পতির বিরহ-ব্যাকুলা কন্যা হেমাঙ্গিনীর পাণি-প্রার্থী হইয়াছেন। হেমাঙ্গিনী কল্পনার ধনকে অলীকপ্রকাশরূপে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় করে আত্মসমর্পণ করিতে অধীরা, কিন্তু পিতা সত্যসিন্ধু স্থির করিয়াছেন পরীক্ষা না করিয়া কাহারও সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না। কলিকাতার একটা ভাড়াটিয়া বাটীতে অলীকপ্রকাশ পরীক্ষা দিতেছেন। সত্যসিন্ধু বাবু সকল সহিতে পারেন কিন্তু মিথ্যা কথা তাঁহার সহ্য হয় না। অলীকপ্রকাশের মুখ দিয়া একটিও সত্য কথা বাহির হয় না। অলীকপ্রকাশ একটি মিথ্যাকে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অপর একটি মিথ্যা কথার আশ্রয় লইতেছেন—এইরূপে অনর্গল মিথ্যা কহিয়া যাইতেছেন। একএক সময় মহাসঙ্কটে পড়িতেছেন, সেই সময়ে হেমাঙ্গিনীর

দাসী প্রসন্নর পাণি-প্রার্থী গদাধর ছদ্মবেশে আসিয়া কোনও প্রকারে তাহার মিথ্যা উক্তিগুলি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। যখন অলীকপ্রকাশ সত্যসিন্ধুকে প্রতারণা করিয়া প্রায় তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থনায় সফল হইয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার সকল বাক্যের অলীকতা প্রমাণিত হইয়া গেল এবং অলীকপ্রকাশ "এমন কর্ম্ম আর করব না" বলিয়া নাকে খৎ দিলেন।

এই প্রহসন খানির প্রত্যেক পংক্তি পাঠ কালে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বঙ্কিমের নভেলি বাঙ্গালার যে সকল ব্যঙ্গানুকৃতি আছে তাহা যথার্থই উপভোগ্য। একস্থানে বিষবৃক্ষের দশম পরিচ্ছেদে হুঁকার প্রশংসার অনুকরণে ঝাঁটার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

আর একস্থলে অত্যধিক নভেল পাঠে বিকৃত-মস্তিষ্কা হেমাঙ্গিনী, দাসীর সাহায্যে অলীকপ্রকাশকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার এক-এক স্থান পাঠ করিতে করিতে চন্দ্রশেখরের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর কথা মনে পড়ে। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দুই-একটি সঙ্গীতেও চমৎকার ব্যঙ্গানুকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর গানে' সুন্দরের উক্তি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক আশ্চর্য্যরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তিটিও 'রামিয়াড' রচয়িতার অনুপযুক্ত হয় নাই।

এই অপূর্ব্ব প্রহসনখানি প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটিতে এবং পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই হইতে যখনই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তখনই তিনি আত্মীয়-বন্ধুগণকে লইয়া কোনও এক আনন্দ-উৎসব করিতে ভালবাসিতেন। এই সকল উৎসবের কল্পনা করিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তিনিই এই সকল অনুষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। 'অলীক বাবু' এবং আরও অনেক প্রহসনাদি এই সকল উৎসব উপলক্ষেই অভিনীত হয়। 'এমন কর্ম্ম আর করব না'র প্রথম অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অলীকপ্রকাশ সাজিয়াছিলেন। মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার মুখে শুনিয়াছি, এই অভিনয়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী 'শুভ-বিবাহ'-রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণী নায়িকা 'হেমাঙ্গিনীর' ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সুধীশ্রেষ্ঠ প্রিয়নাথ সেন মহাশয় এই প্রহসন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব—

" আমি 'অলীক বাবু'র প্রথম পরিচয় পাই অভিনয়-মঞ্চে। সে আজ অনেক দিনের কথা। এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু অলীক প্রকাশ সাজিয়াছিলেন। যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে। যিনি সত্যসিন্ধু বাবু সাজিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয় চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অপরাপর পাত্রদিগের অভিনয়ও অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। অভিনয়ের গুণে রসহীন, অকিঞ্চিৎকর নাটকও মনোহর হইয়া উঠে। এমন অনেক নাটক আছে, রঙ্গমঞ্চে যাহাদের খুব আদর, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই; কিন্তু কেবলমাত্র অভিনয়-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি প্রথম পরিচয়ে 'অলীকবাবু'র অনুরক্ত হইয়া পড়ি নাই। গ্রন্থকারের অট্টহাস্যময়ী রঙ্গিণী কল্পনার উল্লাস-লাঞ্ছিত লাস্য-লীলাতরঙ্গে হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ভিতর একটি নিতান্ত অভিনব রস উপভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের সাহিত্যে ইহা একটি নূতন সামগ্রী। বাঙ্গালায় অনেকগুলি সুন্দর প্রহসন আছে—'একেই কি বলে সভ্যতা,' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির কৌলীন্য-গৌরব কে না স্বীকার করে? হালের আমলে 'বিবাহবিভ্রাট' সম্বন্ধে কোনওরূপ মতবিভ্রাট নাই। ইহারও উপাদেয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত।

"কিন্তু 'অলীক বাবু' ইহাদের সকলগুলি হইতে স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ, ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজবিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে। সমাজের কোনও কুপ্রথা বা কুরীতি, ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন দোষ বা গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া তাহার হাস্যজনক, বিদ্রূপাত্মক বিকাশই প্রহসনের কার্য্য। আমরা যে কয়েকখানি প্রহসনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদেরই ভিতর প্রহসনের এই ধর্ম্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় পূর্ব্বতন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, ইংরেজানুকরণপ্রিয়, আমোদরত বঙ্গযুবকের 'বেলেল্লাগিরির' হাস্যজনক চিত্র। ঐ সকল গুণই বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহ মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে বিবিধ বর্ণে পরিস্ফুট করিয়া 'সধবার একাদশী' রচিত। ইংরাজী শিক্ষায় দীক্ষিতা, জাতীয় ভাব-বিচ্যুতা বঙ্গনারীর সহিত শিক্ষাহীন, চরিত্রহীন বঙ্গযুবকের পরিণয় অবস্থা-বৈচিত্র্যে কিরূপ হাস্যজনক হইয়া থাকে, 'বিবাহ-বিভ্রাট' তাহারই উজ্জ্বল কল্পনা। কিন্তু সমালোচ্য প্রহসনে এরূপ কোন ব্যঙ্গ বা অপর উদ্দেশ্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সরল, উজ্জ্বল, বালকসুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি—

নিছকে বিশুদ্ধ হাসি। কল্পনা উদ্ভট হইলেও সুস্থ অবিকৃত বালকহৃদয়ের কল্পনা। এই আনন্দোচ্ছল, সরল অথচ উদ্ভট কল্পনাতেই গ্রন্থের গৌরব—গ্রন্থকারের প্রতিভা।

* * * *

"এই অপূর্ব্ব কল্পনা হাস্য-রসিকের সৃষ্টি। সাহিত্যে ইহা বিরল। বঙ্গসাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক মোলিয়ের তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকে এইরূপ হাস্যময়ী কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। এ কল্পনার ভিতর কোন বিশাল বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের গূঢ় ছায়া বা নিগূঢ় অভিসন্ধি নাই। হাসিতেও কোন জ্বালা নাই। না থাকিলেও—বা নাই বলিয়াই, ইহা অমূল্য। ইহার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হাসি জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক—কল্যাণকর—শোভাবিধায়ক। ইহা মুক্ত বাতাসের ন্যায় জীবনে বল ও স্ফূর্ত্তি আনিয়া দেয়। কর্ম্মপীড়িত দেহের অবসাদ তিরোহিত করে এবং চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটের ভ্রূকুটি বন্ধন খুলিয়া দেয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই নিরানন্দ বাঙ্গালায় এখনও এমন রঙ্গময়ী প্রতিভা বর্ত্তমান; আমাদের ভিতর এমন লোকও আছেন, যাঁহার আনন্দোদ্বেল হৃদয়ভাণ্ডার হইতে এমন হাস্যময়ী কল্পনার তরঙ্গ বাহির হইয়াছে। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, 'অলীক বাবু' যে কোন লেখকের প্রতিভা-গৌরব বাড়াইবে এবং যে কোন সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবে।"

আর ত নও হে দূরে।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ)

পুলক জাগে হৃদয় মাঝে
তোমার গানের সুরে—
দাঁড়িয়ে আছ কোন্ অসীমের পুরে?
সান্ধ্যতারা নীলাকাশে
তোমার হাসি বিশ্বে ভাসে;
তোমার ছবি নদীর জলে,
শ্যামল উপবনে,
অস্তরবির দীপ্ত রাগে,
উজল বনাঙ্গনে।
একটি আশা আমার মনে জাগে—
তুমি হ'বে আমার সাথী
বিপুল অনুরাগে।
তোমার মধুর স্নেহের ডোরে
বাঁধবে আমায় জীবন ভোরে;
তোমার প্রেমের গভীরতা
আমার বুকে জাগে;
নয়ন তোমায় দিবা-নিশি মাগে।
আনন্দময় পুলক মাঝে
দেখব হৃদয়-পুরে
তুমি আমার খেলার সাথী
আর ত নও হে দূরে।
তুমি সুখী আমার সুখে,
আমার দুঃখ তোমার বুকে;
প্রাণে প্রাণে মিশে আছ
বিশাল জগত জুড়ে।
বন্ধু তুমি, আপন তুমি
আর ত নও হে দূরে।

উড়িষ্যায় বৌদ্ধপ্রভাব।

(২৫০ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৪৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)

(রায়মহাশয় শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ সর্ব্বপ্রথমে কলিঙ্গদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। মহাভারতের যুদ্ধে কলিঙ্গ রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। মগধরাজ অশোকের সহিত কলিঙ্গরাজের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রিয়দর্শী অশোক প্রথম বয়সে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, বুদ্ধের অহিংসাবাদে তাঁহার আস্থা ছিল না। রাজসংসারের জন্য নিত্যই বহু প্রাণী বধ হইত। উড়িষ্যা সে সময়ে কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষ ছিল। মহানদীর ব-দ্বীপকে উড্রদেশ বলিত। ঋষিকুল্যা নদী হইতে গোদাবরীর ব-দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড সে সময় কলিঙ্গ দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। উৎকল দেশ সে সময় বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং বোধ হয় কলিঙ্গরাজ উৎকলদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও নামে মাত্র রাজা ছিলেন। রাজা অশোক বহু সৈন্য-সামন্ত ও লোকজন লইয়া কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। দুই বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি কলিঙ্গরাজ্য বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে বহু সৈন্য হতাহত হয় এবং দেশে যে রক্তের স্রোত বহিয়া যায়, তাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে না। রণোন্মত্ত সৈন্যগণের অত্যাচারে নিরীহ কলিঙ্গবাসীর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর মহারাজ অশোকের মনে দারুণ অনুতাপ হয়। রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া তিনি কলিঙ্গদেশ জয় করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মনে অনুশোচনার তীব্র হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। অবশেষে বৌদ্ধ-

ধর্ম্ম অবলম্বন ও বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত অহিংসাবাদকে জীবনের ব্রত করিয়া তিনি শান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু বৌদ্ধ মঠ সেই সময়ে উড়িষ্যায় স্থাপিত হয়। জীব মাত্রেরই ক্লেশ নিবারণের জন্য মহারাজা অশোক যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম উড়িষ্যার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠে।

একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, বৌদ্ধ ও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় কোনও বিদ্বেষভাব ছিল না। একদিক হইতে দেখিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের ক্রম-পরিণতি বলা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থাসূচক মতবাদ প্রবাহিত হইয়া কালক্রমে বেদ-বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। চার্ব্বাক ঋষি এক সময়ে এই বেদবিদ্বেষী ও চিন্তাশীল ভাবুকদলের অগ্রগণ্য ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক মতের সহিত হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক মতের প্রভেদ নাই বলিলেও হয়। শ্রমণ ও শ্রমণীগণ লোকাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেন। পরবর্ত্তী কালে মহাযানী বৌদ্ধগণ হিন্দু দেব-দেবী তারা, কালী, গণেশ (বিনায়ক), সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিতেন। আজও তিব্বত দেশের লৌকিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই প্রতিচ্ছবি বলিলেই হয়। সেকালে কোনও কোনও রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রাণীগণ হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করিতেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন। এক কথায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে রেষারেষি ভাব ছিল না। শঙ্করাচার্য্যের সময় শক, হূন ও যবন জাতির আদর্শে বৌদ্ধধর্ম্মে নানাপ্রকার অনাচার প্রবেশ করে। এই অনাচারের বিস্তৃতির সহিত দেশময় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি হিন্দুদিগের কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ সঞ্চার হয়। তাহা অষ্টশত খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ শত বৎসর হইতে খৃষ্টাব্দ পাঁচশত পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ ভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

লঙ্কাদ্বীপে একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার একজন শিষ্য তাঁহার আদেশ অনুসারে তাঁহার দন্ত কলিঙ্গ দেশে আনয়ন করেন। সে সময়ে কলিঙ্গ দেশে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। উত্তর-ভারতে সে সময়ে চন্দ্রবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধদেবের দন্ত পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং মহা সমারোহে তাহার পূজার বন্দোবস্ত করিলেন।

তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া সেই দন্তের উপাসনা করিতেন, কিন্তু লৌকিক হিন্দুধর্ম্মে তাঁহাদের আস্থা ছিল এবং তাঁহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। পরবর্ত্তী কালে কলিঙ্গদেশের একজন নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিবার প্রয়াস করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও দেবদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় একচ্ছত্র সম্রাটের নিকট এই ঘটনা লোকমুখে সহস্রগুণ হইয়া রটনা হইল। তিনি কলিঙ্গরাজকে শাসন করিবার জন্য একজন সামন্তরাজকে পাঠাইলেন। সামন্তরাজ দন্ত দর্শনমাত্রে বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি যথাসময়ে এই দন্ত লইয়া চন্দ্রবংশীয় সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট ক্রোধান্ধ হইয়া বুদ্ধদেবের দন্তকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে কিছুই হইল না। লৌহময় হাতুড়িতে তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন, হাতুড়ির আঘাতে তাহার কিছুই হইল না। পরে পূতিগন্ধময় নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু চক্ষের পলকে নর্দ্দমা একটী স্বর্গীয় হ্রদে পরিণত হইল এবং তাহার বক্ষে শত শত পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিল। এই অঘটন ঘটনা দেখিয়া সম্রাটের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং সদলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। এই প্রবাদটি বিশ্বাস করিলে বলিতে হইবে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে কলিঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৌদ্ধপ্রভাব উড়িষ্যা ও কলিঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল।

উড়িষ্যার বহু পর্ব্বতে এখনও বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ুরভঞ্জের গভীর জঙ্গলে, বৌধ, ঢেঙ্কানল প্রভৃতি গড়জাত মহালেও বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়। প্রাচীন পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে অনেক স্থলে বৌদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামে গ্রামে যে সকল দেবদেবী গ্রাম্যদেবতা বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধমূর্ত্তি। এই সকল প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এক সময়ে উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

যতদূর সম্ভব ধারাবাহিক ক্রমে উড়িষ্যার লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতিচিহ্নগুলি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। পর্ব্বতে, জঙ্গলে প্রথম যুগের ছোট ছোট গুম্ফা দেখা যায়। সেই সকল গুম্ফায় প্রথম যুগের বিষয়-বাসনা-হীন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ অনন্যমনে পরমার্থের চিন্তা করিতেন। এই সকল গুম্ফা একেবারে

আড়ম্বরশূন্য। একজন লোক কায়ক্লেশে এই সকল গুম্ফায় প্রবেশ করিতে পারে। গুম্ফাগুলি এত প্রাচীন যে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতগাত্র রৌদ্র ও বারিপাতে রেণু-রেণু হইয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণ পারমার্থিক চিন্তায় দিনাতিপাত করিতেন। পুরী জেলার অন্তর্গত খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও কটক জেলার নরাজ, উদয়গিরি ও অশিয়া পাহাড়গাত্রে এইরূপ কতকগুলি গুম্ফা দেখিয়াছি। এই সকল গুম্ফার জনশূন্যতা ও অকিঞ্চনত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রথম যুগের নিরহঙ্কার ও বিষয়বাসনাহীন সাত্বিকপ্রকৃতি বৌদ্ধ শ্রমণের ছবি আমাদের মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠে। সমগ্র উড়িষ্যা দেশে এইরূপ কত গুম্ফা আছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে! অশিয়া পাহাড়-গাত্রে একটী ছোট গুম্ফা আছে। প্রবাদ এই যে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। এই গুহার সম্মুখে প্রায় এক হস্ত গভীর ও দেড়হস্ত পরিসর একটি জলাধার আছে। একটী অদৃশ্য নির্ঝরের জলে সেই জলাধারটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। জল নিঃশেষ হইলে অলক্ষ্য নির্ঝর হইতে জল আসিয়া পুনর্ব্বার সেই জলাধার পূর্ণ করে। জল কখনও জলাধার পূর্ণ করিয়া বহিয়া পড়ে না কিম্বা গ্রীষ্মের সময় জলাধার কখনও বিশুষ্ক হইয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, একটি অজ্ঞাতনামা বৌদ্ধ শ্রমণের বরে জলাধারটিতে সর্ব্বদা সমভাবে জল থাকে।

পুরী জেলার খুর্দ্দার সন্নিকটে 'খণ্ডগিরি' ও 'উদয়গিরি' নামক দুইটি পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতগাত্রে অনেক গুম্ফা আছে। কোনও কোনও গুম্ফা এত ছোট যে একজন লোক অতি কষ্টে সেখানে থাকিতে পারে। এই সকল প্রথম যুগের গুম্ফা। খণ্ডগিরিতে 'রাণীগুম্ফা' ও 'গণেশ-গুম্ফা' নামক দুইটি দ্বিতল গুম্ফা আছে। কোনও রাণী সংসারবিরাগিণী হইয়া রাণীগুম্ফায় বাস করিতেন এবং পরমার্থচিন্তায় দিনাতিপাত করিতেন। গুম্ফার গাত্রে পাষাণে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী খোদিত দেখা যায়। প্রথম চিত্রে দূত কিছু ফল ও মিষ্টান্ন হাতে করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর বরপক্ষের আগমন ও তাঁহার সহিত কন্যাপক্ষের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর পাত্রীপক্ষের পরাজয় ও পাত্র-পাত্রীর বিবাহ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার পর শিকার ও রাজসভার চিত্র দেখা যায়। শেষ তিন-চারিটি চিত্রে রাজা ও রাণী বিলাস-ব্যসন ছাড়িয়া বৌদ্ধ শ্রমণ ও শ্রমণীর বেশে গুম্ফায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের পার্শ্বচর, অনুচর, দাসদাসী সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মিতাচারে দিনাতিপাত করিতেছেন। গণেশগুম্ফার চিত্র অনেকটা রাণীগুম্ফার অনুরূপ, তবে কতক বিষয়ে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। প্রথম চিত্রে বোধিবৃক্ষের মূলে একজন রাজপুত্র নিদ্রিত এবং তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার প্রণয়িনী বসিয়া আছেন। অন্য একজন রাজপুত্র তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিলেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। উভয় পক্ষই হস্তী লইয়া রণ-ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফলে প্রত্যাখ্যাত রাজ-পুত্রের জয় হইল এবং তিনি তাঁহার মনোনীত কন্যা-রত্নকে লইয়া গেলেন। পরে উভয়ে সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাণীগুম্ফা ও গণেশগুম্ফা ২৫০ খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে ৪৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। এই সময়ে রাজ-দরবারে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ সমাদৃত ছিল এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তী ঢৌলী পর্ব্বতগাত্রে মহারাজা অশোকের খোদিত একাদশ অনুশাসন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ অনুশাসন দেখিলে মহারাজা অশোকের শাসননীতির বিষয় আমরা কথঞ্চিৎ জানিতে পারি। জীবে দয়া ও অহিংসা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অনুশাসন। পূর্ব্বে রাজপরিবারের জন্য প্রতিদিন বহু জীবহত্যা হইত এবং রাজপুরীর দেবমন্দিরেও বলিপ্রদান-কল্পে বহু জীব নিহত হইত। এখন সে সমস্ত উঠিয়া গিয়াছে। জীবে দয়া ও সর্ব্বজীবে সহানুভূতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজ্যের স্থানে স্থানে মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে দুঃস্থ জীবের যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবিশ্বাসীকে সত্য পন্থায় আনিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে মহারাজা অশোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজা অশোকের অনুশাসনে ধর্ম্মবিদ্বেষের ভাব দেখা যায় না। অবিশ্বাসীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। প্রবল ও দুর্দ্দান্তদিগকে উপদেশের দ্বারা সত্যমার্গ-গামী করিতে হইবে। মোটের উপর জীবে দয়া, মৈত্রী ও সেবাধর্ম্ম মহারাজ অশোকের অনুশাসনের মূল ভিত্তি। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রমণ ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের উপযুক্ত সম্মান করিবার বিধান আছে; এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বজীবের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ আছে। এই সকল অমূল্য উপদেশ প্রস্তরগাত্রে খোদিত করিয়াই মহারাজ অশোক নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্রই তিনি পরিদর্শকমণ্ডলী নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শনকালে প্রজাদিগের কার্য্যকলাপ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য করিতেন এবং যথাযথ বিবরণ রাজদরবারে প্রেরণ করিতেন। এই সকল পরিদর্শক একান্ত সত্য-প্রিয় এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা কদাপি কাহারও মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতেন না। প্রতি পাঁচ বৎসরে এক-একবার বৌদ্ধমণ্ডলীর অধিবেশন হইত। সেই অধিবেশনে সম্মিলিত নরনারীগণ পাপাচরণের জন্য অনু-শোচনা প্রকাশ করিতেন এবং ভবিষ্যতে সত্যপথ অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর হইতেন। এই সকল বৌদ্ধমণ্ডলীর সম্মিলনে দেশময় সৎকার্য্যে উৎসাহ ও ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হইত। নরহত্যার জন্য সে সময় প্রাণদণ্ড হইত না, কিন্তু নরহত্যাপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাক্লেশ ভোগ করিতে হইত। ভুবনেশ্বরের সন্নিকটেই মহারাজ অশোকের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। তৎকালে সেই নগর কশৌলী নামে অভিহিত ছিল। এই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হয় এই ধ্বংসাবশে-ষের স্তূপ কোনও অরণ্যে পরিণত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ঢৌলী পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত কোশলাগাঙ্গ নামক বিরাট সরোবরের অবশিষ্টাংশ ঐ প্রাচীন মহতী নগরীর অস্তিত্ব-জ্ঞাপক বলিয়া অনুমান হয়। ঢৌলী পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়। পর্ব্বতে শিব ও গণেশের অতি প্রাচীন মন্দির আছে। পরবর্ত্তী যুগে এই স্থানই শৈবধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল।

কটক জেলার অন্তর্গত ধানমণ্ডল রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৪।১৫ মাইল দূরে ললিতগিরি ও উদয়-গিরি নামে দুইটি অনতি-উচ্চ পর্ব্বত আছে। এক সময়ে ললিতগিরি এক বৌদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এই স্থানে অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্যানী বুদ্ধের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। কোনও কোনও মূর্ত্তির নিম্নদেশে দুই-এক ছত্র শিলালিপি দেখা যায়। প্রবাদ এই যে, ললিতগিরি ও তৎসন্নিকটস্থ দুই-একটি গড়গণের মধ্যে ললিতগিরির রাজার রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। উদয়গিরিতেও এইরূপ একজন ক্ষুদ্র সামন্ত বা স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই পর্ব্বতেও অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাযানী বৌদ্ধেরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাঁহারা তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর ন্যায়ই ছিলেন। উদয়গিরি ও ললিতগিরিতে বোধ হয় এক সময়ে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দুইটী রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়া-ছিল। ললিতগিরি ও উদয়গিরি ভিন্ন সন্নিকটবর্ত্তী কয়ে-কটি পর্ব্বতেও বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। ধানমণ্ডলে মহাবিনায়কের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মহাযানীগণ গণেশকে বিনায়ক বলিয়া অভিহিত করিতেন। অনেকের মতে মহাবিনায়ক উড়িষ্যার গণেশক্ষেত্র এবং পঞ্চক্ষেত্রের অন্তর্গত। মহারাজ অশোকের তিরোভাবের সহিত উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাব হয় নাই, বরং পরবর্ত্তী কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজদরবারের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত ও পরিপুষ্ট হইয়া-ছিল। উড়িষ্যার নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের যে কত নিদর্শন রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বালেশ্বর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ময়ূরভঞ্জ, ঢেঙ্কানল, বৌধ প্রভৃতি গড়জাত মহালে এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বৌদ্ধমূর্ত্তি ও মন্দিরের অনেক ধ্বংসাবশেষ আমরা আজিও দেখিতে পাই। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বহুতর মূক সাক্ষ্য ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক সন্তর্পণে ভূগর্ভ খনন করিলে অনেক ঐতিহাসিক রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন। কাশীধামের নিকটবর্ত্তী সারনাথে ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সকল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা বৌদ্ধযুগের সভ্যতার যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়, শত প্রামাণিক গ্রন্থেও সেরূপ বিশদ প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট। আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক বৌদ্ধযুগের বিক্ষিপ্ত নিদ-র্শনগুলিকে সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করিবার প্রয়াস করেন নাই। ভূগর্ভস্থিত প্রমাণনিচয় সংগ্রহ করা বহু অর্থসাপেক্ষ সন্দেহ নাই। গভীর গবেষণা ও চিন্তাশীলতার সাহায্যে এই সকল প্রমাণকে মালার ন্যায় গ্রথিত করিয়া কল্পনার সাহায্যে অণুপ্রাণিত করা সাধারণ লেখকের কর্ম্ম নহে।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বৌদ্ধ প্রভাবের দুইটী চিহ্ন উড়িষ্যার সামাজিক জীবনে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। সমাজবন্ধন এদেশে বাংলা দেশ অপেক্ষা অনেক শিথিল। অনার্য্যদিগের প্রভাব যে তাহার একটী কারণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রঘুনন্দন ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণ হাঁচি-টিক্‌টিকি পড়িলেও কি করিতে হয়, তাহাও বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গুরুতর পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশ নতশিরে তাঁহাদের আজ্ঞা মানিয়া লইয়াছে। সমগ্র উড়িষ্যাকে এইরূপ বিধয়ের বাঁধনে বদ্ধ করিতে কোনও স্মৃতিকার পারেন নাই। তাহার কারণ এদেশে আর্য্যসভ্যতার সহিত অনার্য্যসভ্য-তার মিশ্রণে আর্য্য জ্ঞান ও গরিমার দীপ্তি অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেও শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ উপনিষদের দিকে লোকের আস্থা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশ দিগন্তবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। এদেশে জঙ্গল ও পর্ব্বত নাই। সুতরাং লোকে যেরূপ সহজেই সমভাবাপন্ন হইতে পারে, পর্ব্বত ও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশের লোকেরা সেরূপ সহজে সমভাবাপন্ন

হইতে পারে না। কেশরী ও গঙ্গাবংশের প্রভাবের সহিত উড়িষ্যায় পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল সত্য, কিন্তু পর্ব্বত ও অরণ্যমধ্যবর্ত্তী জনপদসমূহে বৌদ্ধভাব পূর্ব্ববৎ বহুদিন যাবৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। বর্ত্তমান যুগেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বীর সংখ্যা উড়িষ্যায় নিতান্ত কম নহে। শূন্যবাদী বলিয়া এখনও একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় উড়িষ্যায় বিদ্যমান আছে. তাহাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব সহজেই বুঝা যায়। অলেখধর্ম্মী বা কুম্ভীপটুয়াগণও একেশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী। পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা-উপাসনায় তাঁহাদের আস্থা নাই। তাঁহারা শূন্যবাদ প্রকাশ্যে গ্রহণ না করিলেও মহাশূন্য হইতে যে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পরেও বৌদ্ধভাব ও বৌদ্ধ উপাসনা বহুকাল যাবৎ গুপ্তভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া অন্য কোন বাংলা গ্রন্থে বৌদ্ধবাদের অবতারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। উড়িয়া প্রাচীন সাহিত্য এখনও সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় নাই। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদসম্বলিত কত যে উড়িয়া প্রাচীন গ্রন্থ আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বর্ত্তমানকালেও যে এরূপ গ্রন্থ রচিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধুসন্ত ও সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এখনও বৌদ্ধভাবাপন্ন লোক দেখা যায়। তাঁহারা লৌকিক ধর্ম্ম ও আচার-বিচার মানেন না। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থকে তাঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন,তাহাতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাবের চিহ্ন প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। 'বাউরি' নামক জাতিকে আজকাল উড়িষ্যায় অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। এক সময়ে ঐ জাতি বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল এবং সমাজের উচ্চ-স্থানীয় জাতিগণ তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখা দূরে থাকুক বরং বিশেষ মান্য করিয়াই চলিতেন। প্রবাদ এই যে, রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের আজ্ঞায় এই জাতি প্রথমে অপাংক্তেয় হয়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধপ্রভাবের কিঞ্চিৎ নিদর্শন দিতে হইলে একটি গ্রন্থ লিখিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় ইঙ্গিতে আভাস দেওয়া গেল মাত্র। উড়িষ্যার পর্ব্বতে ও অরণ্যে ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেরই জাজ্জ্বল্যমান প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে উড়িষ্যা একটি বিশাল কর্ম্মভূমি।

রাগ-বিবোধ।

(সোমেশ্বর-কৃত)

(পণ্ডিত ৺ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত)

এবং গলে চ শীর্ষে ত্বাভ্যঃ সপ্ত স্বরাঃ শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ।

স্বয়তো তেষু নিরুক্তা মনঃ স্বতোরঞ্জয়তীতি। ১৪

এইরূপ গলে ও শীর্ষস্থানেও শ্রুতি উৎপন্ন হয়। ঐ দ্বাবিংশতিসংখ্য শ্রুতি হইতে সাতটী স্বর উদ্ভূত হইয়া থাকে। স্বতঃ অর্থাৎ আপনা হইতে মনকে রঞ্জিত করে, এই জন্য ঐ সপ্ত নাদবিশেষে স্বরত্ব কথিত হইয়াছে। ১৪

যেমন হৃৎপ্রদেশ সেইরূপ কণ্ঠ ও মস্তকও শ্রুতির উৎপত্তির স্থান, এই শ্লোকে তাহা কথিত হইতেছে। যেমন হৃদয়ে নাড়ী থাকা হেতু দ্বাবিংশতি শ্রুতির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কণ্ঠ ও মস্তকেও উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে নাদ-সমূহের প্রথমোদ্দিষ্ট শ্রুতিত্ব কহিয়া পশ্চাৎ-উদ্দিষ্ট স্বরত্ব কথিত হইতেছে। ঐ দ্বাবিংশতি-সংখ্য শ্রুতি হইতে সাতটী স্বরের উৎপত্তি হয়। শ্রুত হয় এই হেতু শ্রুতি, সুতরাং শ্রুতি-সমূহ শ্রবণযোগ্য। যদি চ অনুরণনাত্মক স্বরনামে কথিত দীর্ঘধ্বনিরও শ্রবণযোগ্যতা আছে, তথাচ বায়ু ও নখাদির আঘাতের পর কেবল প্রথম-ক্ষণবর্ত্তী ধ্বনিরই শ্রবণযোগ্যতা এস্থলে গৃহীত হইতেছে। এখন স্বরশব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ঐ সাতটী নাদ-বিশেষে স্বরত্ব কথিত হইয়াছে। যেহেতু স্বতঃ অর্থাৎ কারণান্তরনিরপেক্ষ হইয়া শ্রোতার চিত্তকে অনুরক্ত করে, এই জন্য ইহা স্বর, অথবা আপনিই অনুরক্ত করে এই হেতু ইহা স্বর। নিঃশঙ্ক কহিয়াছেন, শ্রবণ-হেতু শ্রুতি এবং শ্রুতির অনন্তরভাবী অনুরণনাত্মক যে শব্দ—যাহা আপনা হইতে শ্রোতৃচিত্তকে অনুরক্ত করিয়া থাকে—তাহা স্বর বলিয়া কথিত হয়। ১৪

ষড়্জর্ষভগান্ধারা মধ্যমপঞ্চমকধৈবতনিষাদাঃ।

ইত্যভিধাস্তেঽমীষাং সরিগমপধনীতি সংজ্ঞান্যা। ১৫

ঐ সাতটী স্বর ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামে অভিহিত। এই ষড়্জাদির স, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই অন্য নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। ১৫

সামান্যত ঐ সাতটীর "স্বর" এই অর্থ-সঙ্গত নাম কহিয়া, পার্থক্যে সাতটী নামও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ সাতটী স্বর-নামে প্রসিদ্ধ। যথা—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। গ্রন্থান্তরে স্বরসমূহের ষড়্জাদি নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্যবহারার্থ উহাদের সঙ্ক্ষেপে সাতটী নাম কথিত হইয়াছে। এই ষড়্জাদির স-রি-গ-ম-প-ধ-নী এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। ষড়্জই স, ঋষভই রি ইত্যাদি। ১৫

তেষাং শ্রুতয়ঃ ক্রমতো বেদা রামা দৃশৌ তথাম্বুধয়ঃ।

নিগমা দহনাঃ পক্ষাবেবং দ্বাবিংশতিঃ সর্ব্বাঃ। ১৬

ঐ স-রি-গ-মাদির শ্রুতি সকল ক্রমে বেদ, রাম, দৃক্, নিগম, দহন, পক্ষ এইরূপে সাকল্যে দ্বাবিংশতি হইয়া থাকে। ১৬

বলা হইয়াছে শ্রুতি হইতে সপ্ত স্বর হয়, সুতরাং

দ্বাবিংশতি শ্রুতিই সামান্যত স্বরাভিব্যঞ্জক। এক্ষণে তাহা ব্যবস্থাপিত হইতেছে। ঐ স-রি-গ ইত্যাদির শ্রুতিসকল ক্রমে অর্থাৎ ষড়্জাদিক্রমে বেদ অর্থাৎ চার, রাম—তিন, দৃশ্—দুই ইত্যাদি। এস্থলে চতুঃসংখ্যক নিগমরূপ অর্থবাচক বেদ শব্দের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই, সুতরাং ঐ শব্দ দ্বারা চার সংখ্যামাত্র বুঝিতে হইবে। রাম ইত্যাদি শব্দেও ঐরূপ। অতএব 'স'এর শ্রুতি চার, 'ম'এর দুই, অম্বু'ধি অর্থে চারই। 'ধ'এর তিন, 'নি'এর পক্ষ অর্থাৎ দুই। এক্ষণে কোহল মতঙ্গ প্রভৃতি-প্রদর্শিত নবধা শ্রুতিভেদে তত্তৎ দোষ দর্শন হেতু দ্বাবিংশতি পক্ষই সমীচীন, নিঃশঙ্ক-মতানুসারে তাহাই সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে, এই শ্রুতি সকল দ্বাবিংশতি। বেণু-বীণাদিতে মন্দ্রাদি-ভেদ থাকিলেও শ্রুতি সকল দ্বাবিংশতিই জানিবে। ইহার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। কোহল কহিয়াছেন, শ্রুতিজ্ঞেরা কেহ কেহ শ্রুতিকে দ্বাবিংশতি, কেহ কেহ ষট্‌ষষ্টি, কেহ কেহ অনন্ত বলিয়া থাকে। মতঙ্গ-মতে শ্রুতি এক হইলেও দ্বিধা, কিন্তু সাকল্যে নয়টি মাত্র। ১৬

তুর্য্যায়াং সপ্তম্যাং তাসু নবম্যাং শ্রুতৌ ত্রয়োদশ্যাং।
সপ্তদশীবিংশীদ্বাবিংশীষু চ তে স্ফুটাঃ ক্রমতঃ ॥ ১৭

এই সরিগমাদি ঐ শ্রুতি সমূহে চতুর্থ সপ্তম নবম ত্রয়োদশ সপ্তদশ বিংশ ও দ্বাবিংশে ক্রমে স্ফুট হইয়া থাকে। ১৭

স্বরসমূহের এইরূপ শ্রুতিসংখ্যা ঐরূপে নিয়মিত হইলেও স্বস্ব অন্তিম শ্রুতিতে উহাদের স্ফুটতা কথিত হইতেছে। ঐ সরিগমাদি ঐ দ্বাবিংশতি শ্রুতিসমূহের মধ্যে ক্রমে অর্থাৎ ষড়্জাদিক্রমে প্রকট হইয়া থাকে। স চতুঃশ্রুতি হইলেও চতুর্থ শ্রুতিতে স্পষ্ট হয়, রি ত্রিশ্রুতি হইলেও সপ্তমীতে নিজের তৃতীয়াতে, দ্বিশ্রুতি গ নবমীতে নিজের: দ্বিতীয়াতে, চতুঃশ্রুতি ম ত্রয়োদশীতে নিজের চতুর্থীতে, চতুঃশ্রুতি প সপ্তদশীতে নিজের চতুর্থীতে, ত্রিশ্রুতি ধ বিংশীতে নিজের তৃতীয়াতে এবং দ্বিশ্রুতি নি দ্বাবিংশীতে নিজের দ্বিতীয়াতে স্পষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রুতি হইতে স্বর হয় এই কথা বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে পাঁচটা পক্ষ দাঁড়াইতেছে। জাতি ও ব্যক্তির ন্যায় স্বর ও শ্রুতির তাদাত্ম্য আছে ইহা প্রথম। দর্পণে যেমন মুখ বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ শ্রুতিতে স্বর বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ইহা দ্বিতীয়। ঘটের সম্বন্ধে যেমন মৃৎপিণ্ড ও দণ্ডের কার্য্যতা আছে, সেইরূপ স্বরের সম্বন্ধে শ্রুতির কার্য্যতা আছে এই তৃতীয়। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রুতিসকল স্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে ইহা চতুর্থ। দীপ থাকিলে অন্ধকারস্থ ঘটাদির যেমন অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ শ্রুতি থাকিতে স্বরসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ইহা পঞ্চম। ১৭

পৃথুবক্ষ্যমাণবীণামেরৌ স্থাপ্যাশ্চতস্র ইতি তন্ত্র্যঃ।
মন্দ্রতমধ্বনিরাদ্যা ত্রয়ঃ ক্রমোচ্চস্বনং কিঞ্চিৎ ॥ ১৮

পৃথু বক্ষ্যমাণ রুদ্রবীণার মেরুতে চারিটী তন্ত্রী এই প্রকারে স্থাপন করিবে। আদ্যা তন্ত্রী মন্দ্রতমধ্বনি আর তিনটী কিঞ্চিৎ উচ্চস্বন করিবে। ১৮

এই শরীরে প্রতিস্থানে দ্বাবিংশতি নাড়ী-সন্নিবেশ আছে; কিন্তু তত্রত্য শ্রুত্যুৎপত্তি পরোক্ষ বলিয়া তৎসত্তায় লোকের সন্দেহ হইতে পারে। সেই সন্দেহ নিরাস ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিমিত্ত বীণাতে শ্রুতি ও স্বরজ্ঞানের উপায় গ্রন্থকার স্ববুদ্ধি দ্বারাই কহিতেছেন। দ্বিতীয় বিবেকে বক্ষ্যমাণ রুদ্রবীণার পৃথু অর্থাৎ তির্য্যক্-বিস্তীর্ণ যে মেরু-মেঢ়ক অর্থাৎ বীণার উর্দ্ধভাগে অবষ্টম্ভিত কিনা লাগান যে তন্ত্রীর আধার (ইহা সারীবিশেষ বলিয়া খ্যাত), তাহাতে নিম্নোক্ত প্রকারে চারিটী লৌহ তন্ত্রী স্থাপন করিবে। তন্মধ্যে প্রথম তন্ত্রী বাদকের বামস্থ থাকিয়া মন্দ্রতমধ্বনি অর্থাৎ অতিশিথিল করিয়া অতি নীচস্বনা করিবে। আর তিনটী অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তন্ত্রী কিঞ্চিৎ উচ্চস্বনা,—দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় উচ্চস্বন এবং তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ উচ্চস্বন করিবে। ১৮

ন্যস্যাঃ সূক্ষ্মাঃ সার্য্যোঽথ দ্বাবিংশতিরধশ্চরমতন্ত্র্যাঃ।
তন্ত্রী যথেয়মুচ্চোচ্চতররবা কিমপি তাসু স্যাৎ ॥ ১৯

পরে চরম তন্ত্রীর নিম্নে সূক্ষ্ম দ্বাবিংশতি সারীসকল এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যাহাতে এই তন্ত্রীর ঐ সমস্ত সারীতে অল্প উচ্চোচ্চতর রব হইতে পারে। ১৯

পরে চরম তন্ত্রীর নিম্নে অর্থাৎ বীণাদণ্ডের পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম দ্বাবিংশতি সারী অর্থাৎ কাষ্ঠাদিময়ী উর্দ্ধপট্টিকা স্থাপন করিবে। স্থাপনপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যে প্রকারে এই চতুর্থ তন্ত্রী ঐ দ্বাবিংশতি সারীতে অল্পরূপ উচ্চ ও উচ্চতর ধ্বনি-সম্পন্ন হয় এই প্রকারে স্থাপন করিবে। এস্থলে মেরুস্থ চতুর্থ তন্ত্রীধ্বনির প্রথম সারী কিঞ্চিৎ উচ্চধ্বনি, দ্বিতীয় সারী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর ধ্বনি হইবে। এইরূপ দ্বিতীয় সারী অপেক্ষা তৃতীয় ও চতুর্থ সারীর উচ্চোচ্চতর ধ্বনি হইবে। আবার এইরূপই তৃতীয় সার্য্যাদি অপেক্ষা চতুর্থ ও পঞ্চম প্রভৃতিতে পর-পর উচ্চোচ্চতরতা জানিবে। ১৯

দ্ব্যন্তর্নৈষ্টোন্যরবঃ শ্রুতয়ঃ ইতি রবা ইহাস্ত্য-
তন্ত্র্যাং সঃ।
ঋষভস্তৃতীয়সার্য্যাং গঃ পঞ্চম্যাং নবম্যাং মঃ ॥ ২০

দুই-দুইএর মধ্যে অন্য রব ইষ্ট নয়, এইরূপ যে সমস্ত রব তৎসমুদয়ই শ্রুতি। এই সারীসমূহে অন্ত্য তন্ত্রীতে ষড়জ, তৃতীয় সারীতে ঋষভ, গ পঞ্চমীতে, ম নবমীতে অভিব্যক্ত হইবে। ২০

উচ্চোচ্চতরত্বেরও প্রকার কথিত হইতেছে। দুইএর দুইএর মধ্যে অন্য রব অভিপ্রেত নহে অর্থাৎ নাদান্তর করিবে না। তন্ত্রীধ্বনিদ্বয়ের এবং সারী-ধ্বনিদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বধ্বনি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং পরধ্বনি হইতে কিঞ্চিৎ নীচ নাদান্তর যাহাতে উৎপন্ন না হয় সেইরূপ ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চোচ্চতরতা করিবে। এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা হইতেছে। রব অর্থাৎ তন্ত্রী-মেরু-সারী-সংযোগ-সমুত্থিত যে সমস্ত ধ্বনি তৎসমুদায় শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রুতিসকল প্রতিপাদন করিয়া ষড়্‌জাদির অভিব্যক্তি কথিত হইতেছে। এই সারিসমূহ অর্থাৎ রবসমূহ মধ্যে অন্ত্যতন্ত্রী অর্থাৎ মেরু-শ্লিষ্ট চতুর্থ-তন্ত্রী-রবে স অর্থাৎ ষড়জ অভিব্যক্ত হয়। এখানে তন্ত্রী শব্দে তদুদ্ভব রব লক্ষিত হইয়াছে। ঋষভ তৃতীয় সারী অর্থাৎ তৃতীয় সারীরবে ব্যক্ত হয়। সারীসমূহের তৃতীয় পঞ্চম ও নবমস্থাদি সারী লক্ষ্য করিয়া, কিন্তু মেরু লক্ষ্য করিয়া নহে ইহা বুঝিতে হইবে। গ পঞ্চমীতে এবং ম নবমী সারীতে। ২০

ধর্ম্মপথ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মুখবন্ধ।

বর্ত্তমান নবযুগে আমরা জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পুরাতন যুগ নানাবিধ পুরাতন ভাবের সহিত ধীরে ধীরে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে; নবযুগ অপরদিকে নব জীবনের নব নব ভাবের মুক্তভাণ্ডার লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যে প্রাণসখা আমাদিগকে জীবনমরণের ভিতর দিয়া এই যুগসন্ধিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনের দ্বারা জীবনকে ধন্য করিবার অবসর দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম কর। কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। তাঁহার অমৃতধামের যাত্রীগণের মধ্যে সকলের অগ্রগামী হও—সকলের অগ্রে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও।

প্রেমের বন্ধন।

সেই প্রাণসখা জীবনসুহৃৎ তাঁহার সহস্র বাহু বাড়াইয়া আমাদিগকে প্রেমের আলিঙ্গন দিবার জন্য এবং তাঁহার স্নেহহস্তে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার বিজন আসন হইতে নামিয়া আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদাই দণ্ডায়মান। তাই সুন্দর প্রভাতে পাখীরা সুতানে গান গায়, পুষ্পসকল সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তোলে। তাই শত দুঃখশোকের মধ্যে, শত শেলসম আঘাত ভেদ করিয়াও দিকে দিকে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠে; তাই দিকে দিকে তাঁহার নামে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া জগতবাসীকে আকুল করিয়া তোলে। চক্ষু খুলিয়া দেখ, কান পাতিয়া শোন, শতকণ্ঠে তাঁহার নামে সঙ্গীত উঠিয়া ভূলোক ও দ্যুলোককে এক করিতেছে, ইহলোক ও পরলোককে প্রেমের সূত্রে বাঁধিতেছে—মঙ্গল ও কল্যাণের একসুরে সকল ভুবনকে ডুবাইয়া দিতেছে নবযুগের নব আশায় উচ্ছ্বসিত এই নবীন প্রভাতকে অবহেলায় বৃথা কর্ম্মে বহিয়া যাইতে দিও না। বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি কর; নরনারীর মুখে আনন্দশ্রীতে তাঁহাকে উপলব্ধি কর; এবং হৃদয়ের আনন্দে অন্তরে সেই আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি কর।

বিবেক ও বৈরাগ্য ধর।

তোমাদের জ্ঞান ও প্রেমকে সমুজ্জ্বল কর। একনিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যত্নবান হও। বীরের ন্যায় সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে অটল হইয়া থাকিও। আবশ্যক হইলে সংসারের যাহা কিছু, তাঁহার জন্য সমস্তই ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিও। সুখসম্পদের ন্যায় দুঃখ, শোক, বিপদ, আপদ, সমস্তই তাঁহারই মঙ্গলবিধান বলিয়া সন্তোষের সহিত নতমস্তকে বহন করিবে। বিবেক ও বৈরাগ্যকে সহায় করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। তাঁহার অভয়পদ নিশ্চয়ই লাভ করিবে। মৃত্যুও তোমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। ইহলোকে যখন তোমাদের কর্ম্মের অবসান হইবে, তখন তাঁহার সেই অভয়পদ আশ্রয় করিয়া হাসিতে হাসিতে সংসারের পরপারে উপনীত হইবে। তাঁহার করুণায় তোমাদের অনন্তজীবন ভরিয়া উঠিবে।

নাম-সঞ্জীবনী।

তাঁহার পবিত্র নামে তোমাদের প্রাণ জাগিয়া উঠুক—ভগবানের সঞ্জীবনীশক্তির নবতর স্পর্শে শক্তিময় হৌক। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা যেমন শতবিধ ছন্দে গগনপ্রাঙ্গণকে এক আশ্চর্য্য সুরে প্রতিধ্বনিত

করিয়া তুলিতেছে, তেমনই তোমাদেরও অন্তরে তাঁহার নাম দিবানিশি শতবিধ তাল ও সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক। তিনিই আমাদের পরম গতি তিনিই আমাদের পরম শান্তি, তিনিই জগতজীবন, তিনিই সন্তাপহারী ভক্তবৎসল। তিনিই দুর্ব্বলের বল, অনাথের আশ্রয়, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাক। তিনিই তোমাদের সমস্ত পাপতাপ হরণ করুন, সকল দুঃখকষ্টের অবসান করিয়া সুখসম্পদ বিধান করুন।

তাঁহারই শরণ লও।

তোমাদের মনঃপ্রাণ তাঁহার মঙ্গলস্পর্শলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহারই চরণে ধাবিত হোক। আনন্দের নির্ম্মল নির্ঝর চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক—হৃদয়নদীর দুই কূল ভাসাইয়া দিক। নবযুগের এই প্রথম প্রভাতে তোমাদের নিজের বলিয়া কিছুই রেখো না। তোমাদের সমস্তই তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দাও। তাঁহার প্রেমের ধারায় তোমাদের দুঃখশোকের জ্বলন্ত হুতাশন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হোক। বিপদ-আপদের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হোক। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে ইহজীবনে যেমন, মরণেও সেইরূপ অনুপম শান্তিলাভ করিবে। তাঁহাকে পরিত্যাগ কর—ভয় হইতে ভয়ে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হইবে।

মৃত্যুকে অতিক্রম কর।

কনকভানুর উজ্জ্বল জ্যোতিতে, পূর্ণচন্দ্রের রজত কিরণে সেই মঙ্গলময়েরই প্রকাশ উপলব্ধি কর। প্রকৃতির ভিতরে তাঁহারই প্রসন্ন মুখের মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিয়া হৃদয়কে পূর্ণ কর। তোমাদের অন্তরের অন্ধকার কাটিয়া যাউক। তোমাদের জীবন নবভাবে নবোৎসাহে পূর্ণ হোক। তাঁহার অরূপ রূপের ধ্যানে আপনাকে অনুক্ষণ নিমগ্ন রাখ; তাঁহার বাণীর অনাহত নাদ অনুক্ষণ শ্রবণ কর। তোমাদের চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হোক, সুগন্ধে গগন ভরিয়া উঠুক। মৃত্যুর বিভীষিকা তোমরা অতিক্রম কর।

জাগিয়া ওঠ।

সমস্ত প্রকৃতির মত তাঁহার নামে তোমাদেরও জাগিয়া উঠিতে হইবে। আলস্যের কোলে মাথা রাখিয়া আরাম উপভোগ করিতে থাকিলে আর চলিবে না। সমস্ত গগন তাঁহার নামে আনন্দধারায় উথলিয়া উঠে। আমাদেরও আনন্দমনে তাঁহারই জয়গান গাহিতে হইবে এবং তাহারই তালে তালে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের হৃদয় হইতে যে জয়গান সমুত্থিত হইবে, তাহার তালে তালে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের নব নব তরঙ্গ জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারা আনন্দময় ভগবানেরই চরণতলে ধাবিত হইবে। আমাদের হৃদয়কে সমস্তক্ষণ নিজেরই সুখদুঃখের চিন্তাতে নিমগ্ন রাখিলে চলিবে না—অন্তরকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিলে চলিবে না।

সংসার-সেতু।

তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ কর। তিনিই লোকসকলকে সেতুস্বরূপ হইয়া ধারণ করিতেছেন। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর। তিনি আমাদের অন্তরতম প্রাণসখা। চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া সেথানে তাঁহারই আসন প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহার পূজায় মনঃপ্রাণ অর্পণ কর—তোমাদের সকল ভয়, সকল দৈন্য বিদূরিত হইবে; দেবদুর্লভ অমৃতধাম সহজেই তোমাদের হস্তগত হইবে। অমৃতধামের যাত্রাপথে যদি কখনও তোমাদের শ্রান্তিক্লান্তি আসে, তখন তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া পথের শ্রান্তি দূর করিও, এবং বিজয়ীর বলে আবার অগ্রসর হইও। তাঁহার জয়েই তোমাদের জয়। ইহলোক ও পরলোক, সর্ব্বত্রই তাঁহার স্নেহপ্রেমে সমাবৃত আছে জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও।

দুঃখের শান্তি।

দুঃখশোকে, বিপদে, আপদে, তোমাদের কাহারও অন্তর যদি নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে, তবে সেই দয়াময় ভগবানের চরণে আছড়াইয়া পড়—সকল দুঃখের শান্তি হইবে। পাপে তাপে যদি তোমাদের কাহারও অন্তর জীর্ণশীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষের শরণাগত হও—তিনি তাঁহার স্নেহপ্রেমের শান্তিধারায় তোমাদের সকল পাপ, সকল তাপ বিধৌত করিয়া দিবেন। নিজ দোষে ভুলভ্রান্তি করিয়া যদি কেহ আপনাকে তাঁহা হইতে দূরে রাখিয়া থাক এবং

তাঁহার করুণাবারি হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া থাক, তবে স্নেহকরুণার সেই অক্ষয় উৎসের নিকটে যাও—তাঁহার প্রেম-সুধায় তোমার হৃদয় ভরিয়া যাইবে।

ভগবৎপূজায় প্রবৃত্ত হও।

প্রাচীন ও নবীন যুগের এই সন্ধিক্ষণে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও—ভক্তিপ্রেমের সুগন্ধে এই পবিত্র সময়কে পবিত্রতর করিয়া তোল। অহঙ্কার, অভিমান, গর্ব্ব সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ কর। তাঁহারই আদেশপালনে সমস্ত জীবন, সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর। সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইয়া তোমাদের মন-প্রাণ আনন্দময় হইয়া উঠুক। তোমাদের আনন্দধ্বনিতে সমস্ত গগন মুখরিত হৌক। আনন্দাশ্রুতে তোমাদের বক্ষ ভাসিয়া যাক। তাঁহাকে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর, তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ কর—তোমাদের সকল আশা পূর্ণ হৌক, প্রাণের সকল পিপাসার শান্তি হৌক। তাঁহাতেই আমাদের সকল ভোগ, সমস্ত প্রেম, সমস্ত ইচ্ছার পরিসমাপ্তি।

Srimoti Brahmomoyi Hindu Orphans' Fund.

NOTIFICATION – NO· 3552F.

The 24th July 1893—Whereas a notification No 2957F dated the 19th June 1893, was published at pages 548–49 Part 1 of the Calcutta Gazette of the 21 idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor, upon the application and with the concurrence of Babu Money Lall Mullick, of No 81, Lower Chitpur road, in the town of Calcutta, to make an order vesting one 4 per cent. Government Promissory Note No $\frac{092074}{086100}$ of 1854—55 for Rs 25000 in the Treasurer of Charitable Endowments for the territories subject to the Government of Bengal upon the terms mentioned in that notification, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification, it is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred by sections 4&5 of the Charitable Endowments act 1890 the Lieutenant-Governor does hereby order and direct that the said Government Promissory note of the 4per cent loan, of which the particulars are contained in the first schedule hereunder written, shall as from the 26th July 1893 vest, and be thenceforth vested in the said treasurer of Charitable Endowments for Lower Provinces to be held by him and his successors (subject to the provisions of the said Charitable Endowments act, 1890, and any rules from time to time framed thereunder by the Governor-General in council) upon trust forever hereafter to receive the interest of the said security when and as the same shall become due and payable,and from time to time to apply the same in terms of the scheme for the creation of an Endowment for the maintenance and education of Hindu male orphans in and about Calcutta, of which particulars are contained in second schedule hereunder written, and it is hereby further notified that the said scheme, of which the particulars are contained in the said second schedule, shall come into operation on the vesting of the said security in the said treasurer of Charitable Endowments for the territories subject to the Government of Bengal.

The first schedule above referred to

Particulars of Government security

One 4 per cent. Government Promissory Note No $\frac{062074}{086100}$ of 1854–55 for Rs 25000.

The second schedule above referred to.

Particulars of scheme.

1. The endowment hereby created shall be called in memory of the donor's mother "the Sreemutty Brohmomoyi's Hindu orphans' fund," and its object is and shall be the provision of a suitable monthly grant in aid to Hindu male orphans in and about Calcutta who are unable to maintain and educate themselves for want of means.

2. The Trustees to be appointed under section 5 (1) of Act VI of 1890 to administer the trust shall be—

(1) A Government official to be nominated for the purpose from time to time by the Lieutenant Governor of Bengal for the time being.

(2) The president for the time being of the British Indian Association or such one among the Vice-Presidents of that Association as may from time to time be nominated for the purpose by the committee of that Association.

(3) The Acharja for the time being of the Adi-Brahmo-Somaj.

(4) The donor or founder of the said endowment, Babu Money Lall Mullick, or in his absence such person as he may nominate in writing to act as his delegate for the time being, and from and after the death of the said Money Lall Mullick, his grandson, Suttopreo Mullick, for his life and after his death the senior then living of the grandsons now living of the said Money Lall Mullick in succession during their respective lives, and after the death of all of such grandsons, then the senior member of the family of the said Money Lall Mullick then living. Provided always that if the President or Vice-president (as the case may be) of the said British India association or the Acharja for the time being of the said Adi Brahmo somaj or either of them shall at anytime hereafter refuse or decline or become incapable to act as trustees or trustee, or if any of the said official appointments shall at any time hereafter be determind and cease to exist, then and in every or any of such events happening, it shall be lawful for the said Money Lall Mullick during his life time and from and after his death for the continuing trustees or trustee to apoint another person or persons to be a trustee or trustees in the place and stead of the person or persons so refusing or becomeing incapable to act, or whose official appointment shall have so ceased to exist as afore said, and every such appointment shall be notified in the Calcutta Gazette; and from and after the publication of such notification the person or persons so appointed shall be and become a trustee or trustees jointly with the continuing trustees or trustee.

3. The duties of the said trustees shall be as follows; that is to say, they shall appropriate and apply the interest of the said Government security for Rs 25000 which shall be paid to them by the treasurer of Charitable Endowments for the teritories subject to the Government of Bengal, as and when the same accrues due in paying for or towards the support as well as education of each of such number of destitute or indigent Hindu male orphans in and about Calcutta as the funds in the hands of the trustees will admit monthly sums or grants in aid of not less than Rs 2 nor more than Rs 4 in amount according to the trustees may deem proper. Such orphans shall be selected from time to time as occasion may arise by the said trustees or any two or three of them but no orphans shall be eligible for selection unless he can produce a certificate signed by two respectable residents of his neighbour-hood testifying to his good character and to his being a worthy object for

charity, and it shall be incumbent upon the trustees from time to time to make enquiries into the circumstances of each recipient of the charity, and they shall be at liberty to continue the payments to each recipient for so long as they shall think fit and at any time to revoke or reduce the allowances if they shall consider just cause for so doing exists.

4. The trustees may hold meetings for the despatch of business at such times and places, and may adjourn and otherwise regulate such meetings as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes, and in case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote.

5. The trustees may elect a chairman of their meetings. If no such chairman is elected or if he is not present at the time appointed for holding the same, the trustees present shall choose one of their number to be chairman of such meeting.

6. Munites shall be made in books to be provided for that purpose of the name of the trustees present at each meeting and of all resolutions and proceedings of the trustees. Any such minute signed by any person purporting to be chairman of any meeting shall be receivable in evidence of the facts therein stated without further proof.

J. A. Bourdillon,

Offg. Secy to the Govt. of Bengal.

Notification—No

The 31 July 1893—In continuation of the notification No 3552F, dated the 24th July 1893, regarding the Sreemutty Brohmomoyi Hindu Orphans' Fund, published at pages 658-59, part 1 of the Calcutta Gazette of the 26th idem, it is hereby notified that, in accordance with clause II (l) of the particulars of the scheme therein published, the Lieutenant Governor is pleased to nominate, under section (1) of the Charitable Endowments act VI of 1890, the Chairman of the Calcutta Corporation for the time being to be one of the trustees for the administration of the above fund.

শিক্ষার তাড়না।

(শ্রীসুষমা দেবী)

রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয় তাঁহার "হেল্‌থ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ ষ্টুডেণ্ট্‌স্" পুস্তকে বলিয়াছেন যে,বঙ্গীয় ছাত্রদের ন্যায় দৈহিক অবনতি অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। ইহা একটি অকাট্য সত্য। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ও বাল্যবিবাহ এবং এই দুইটির সহিত আধুনিক পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শিক্ষার তাড়নাও যে ইহার আর একটি বিশেষ কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় নামটি উচ্চ স্থানে রাখিবার নিমিত্ত ছাত্রেরা মস্তিষ্ককে লইয়া যে ঘোড়দৌড়া খেলায়, তাহার ফলে তাহাদের আজ এই শীর্ণ দশা উপস্থিত।

যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছে, তাহারা প্রায় অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবন-যুদ্ধে আর সেরূপ সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অতিশয় স্বাভাবিক। পাঠ্যাবস্থায় মস্তিষ্কের চালনায় উহার শক্তিক্ষয় খুবই হয়। ফলে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায়ই; সেই সঙ্গে সমস্ত দেহের মধ্যেও এমন একটা অবসাদ আসিয়া পড়ে যে, যে শক্তি ও যে উদ্যমে পাঠ্যকালে ছাত্র এত সম্মানলাভ করিয়াছিল, সে শক্তি সে উদ্যম কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ছাত্রদের মৌলিক বা উদ্ভাবন-সাপেক্ষ কর্ম্ম করিবার শক্তিও লোপ পাইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে আপন জীবিকাবৃত্তি-উপায়কালেও প্রতিভা দেখাইতে পারে না।

শরীররক্ষার জন্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় স্নান, আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম ইত্যাদিও অনেক ছাত্রের স্মরণ থাকে না অথবা নিয়মিত সময়ে করিতে অবহেলা করে। তাহারা প্রায় বদ্ধ ঘরে বদ্ধ হাওয়ায় দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় পাঠে ব্যস্ত থাকিয়া কাটায়। প্রকৃতি এই ঘোর অবহেলা কখনও নীরবে সহ্য করে না, সর্ব্বদা সুযোগ

অন্বেষণ করে তাহার প্রতি এই অবহেলার প্রতিশোধ তুলিতে। এ জন্য যে উহার অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাও বোধ হয় না।

উচ্চ সম্মানাকাজ্ঞী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়তম যুবকবৃন্দ অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মস্তিষ্কের বলক্ষয় করিয়া ফেলে; কিন্তু শীঘ্র দীর্ঘ বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার ও রসায়ন ঔষধের দ্বারা উহার জীর্ণ সংস্কার না হইলে চিরকালের নিমিত্ত উহা নিস্তেজ হইয়া যায়। দেহের মধ্যে মস্তিষ্ক প্রধান যন্ত্র। ইহা নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অন্যান্য সমুদায় যন্ত্রগুলির মধ্যে গোলযোগ আসিয়া পড়ে।

এই ছাত্রজীবন শরীর ও মন উভয়েরই পূর্ণতা লাভ করিবার সময়—যাহাকে আমরা চলিতকথায় 'উঠতি বয়স' বলি। এই সময় ব্যায়াম, মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ, পুষ্টিকর খাদ্য আহার, নির্দ্দোষ আমোদ ও নিয়মিত পাঠ অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শরীর যাহাতে বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা চাই। এই কালে পুস্তকভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যকে অবহেলা করিয়া আমাদের উপস্থিত বংশধরগণ অল্পায়ু ও খর্ব্বাকৃতি বামন অবতার হইয়া দাঁড়াইতেছে।

প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই গোল বাধিবার ভয়। কোনও একটি বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া যদি প্রত্যেক ছাত্র দিবসের চব্বিশ ঘণ্টাকে পাঠ, আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম ইত্যাদির জন্য নিয়মপূর্ব্বক বিভক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে পরীক্ষাগুলি অনেক সহজসাধ্য হইয়া আসে। অবশ্য প্রথমে এই নিয়মানুযায়ী দৈনিক কর্ম্মগুলি সাধন করা একটু দুরূহ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু "অভ্যাস মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব" এই বাক্যের সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে যদি একটুও ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক ছাত্রেরা এইরূপ নিয়মমত কার্য্য করিতে অভ্যাস করে। উহা ক্রমশঃ এরূপ ভাবে প্রকৃতিগত হইয়া যায় যে, অন্য ভাবে চলা-ফেরা ক্লেশকর হইয়া উঠে।

ছাত্রজীবনে আরও একটি দোষ আছে তাহা না বলিয়া থাকা যায় না। ঐ দোষে যে বঙ্গীয় ছাত্রদের বহু অবনতি হইতেছে তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। সমস্ত বৎসরটি উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাস-পাঠ, বায়স্কোপ ও থিয়েটর দেখিয়া এবং গল্প-গুজবে কাটাইয়া দেওয়া হয়। পরে পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কোনক্রমে "পাস" হইয়া যায়, কেহ বা "ফেল"ও হয়। অবশ্য উত্তীর্ণ হইলে অনেকে আস্ফালন করে যে, "আমি দু-এক ঘণ্টার বেশী রোজ রাতে ঘুমাই নাই; আর দু-বছরের পড়া বোধ হয় দু-মাসে পড়ে পাস হয়েছি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের বিবেচনায় ইহাতে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। ঐরূপ তাড়া-হুড়া ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বই-য়ের পাতাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কোনও প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাবটি ধারণ করিতে পারিলেই কি প্রকৃত বিদ্যালাভ হয়? তাহা ত আমাদের মনে হয় না। এইরূপ পাঠের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবক-গণের "বি-এ, এম-এ পাস দিয়াও এক কলম ইংরাজি লিখিতে পারে না" ইত্যাদিরূপ সুনাম শুনা যায়; আর চশমার সঙ্গেও ছাত্রদের এত ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা দেখা যায়। বৎসরের প্রারম্ভ হইতে নিয়মিত ভাবে পড়িলে পরীক্ষার সময় কখনই রাত্রি জাগিয়া পড়িতে হয় না। রাত্রি এগারটার পর পড়া আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাহারও আদৌ উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থিয়েটর বায়োস্কোপ প্রভৃতি সাধারণ আমোদপ্রমোদের স্থানগুলি ছাত্রজীবনে যেমন বিষবৎ পরিত্যাজ্য, সেইরূপ সঙ্গীতচর্চ্চা, টেনিস্, ক্রীকেট ফুটবল এবং দেশীয় বহুপ্রকার খেলা কিংবা অল্প-স্বল্প ব্যায়াম, সন্তরণ এবং নিজেদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাট্য অভিনয়াদি ও কাব্যপাঠরূপ নির্দ্দোষ আমোদের দ্বারা শরীর মন ও মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়াও অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

ছাত্রগণ অতিরিক্ত ভাবে পাঠে নিমজ্জিত হইবার জন্য শুদ্ধ উহাদিগকেই দোষারোপ করা যায় না। আজ-কাল বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ের পুস্তক তালিকা দেখিলে শরীরে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। বাড়ীর সামনে দিয়া যখন বালকের দলকে এক গাদা পুস্তক-বগলে করিয়া বিদ্যালয়ে বিলম্ব হইবার ভয়ে দ্রুত যাইতে দেখি, তখন আমার হৃদয়ে মহা শঙ্কা উপস্থিত হয় যে, কি করিয়া ঐ শিশু মস্তিষ্কে অতগুলি বহির বিষয় সংকুলান হইবে? ছোট ছোট বালকদের ভিন্ন প্রকারের এত অধিক বিষয় পড়িতে হয়, আবার এক-একটি বিষয়ে এত অধিক বহি যে, বাধ্য হইয়াই কোমলমস্তিষ্ক বালকদিগকে খেলাধূলা ত্যাগ করিয়া পুস্তকের কীট হইতে হয়। এইরূপ শিক্ষার তাড়নায় ছাত্রদের শিশুকাল হইতে দৈহিক অবনতি আরম্ভ হয়; সুতরাং এইরূপ শিক্ষার অতি শীঘ্র সংশোধন আবশ্যক তাহা সকলেই বলিবেন।

প্রেমের বন্ধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহাধনী আমি রয়েছি সুখে প্রাসাদের' পরে।
নাহি হেথা যেন দুখের লেশ বাহিরে অন্তরে।
উঠে শোন ঐ ক্রন্দন নিয়ত মহা হাহাকার।

দূর-দূরান্তরে পল্লীর মাঝে – কিছু নাহি আর—
দিবানিশি জাগে—শুধু হাহাকার।
যাহাদের তরে রয়েছি বেঁচে সুখের সন্তান।
যাহাদের শ্রমে রয়েছে জেগে কবিতার প্রাণ ॥
কভু যদি আসে কাতর স্বর তাহাদের হতে—
শুনিব না তা—যদি পশে তাহা
শ্রবণের পথে—হোক দূর হতে ?
তাদের কেন বাসিব না ভাল—ভাই নহে তারা ?
তাদের অশ্রু মুছাব না কেন—বন্ধু নহে তারা ?
চন্দ্র সূর্য্য উঠি' ঢালিছে প্রেম।
অনন্ত তারকা দিতেছে প্রেম ॥
ঋতু বর্ষ যায় প্রেম রাখিয়া।
ফুল ফুটে উঠি' পড়ে ঝরিয়া ॥
যৌবনের প্রেম দেয় রাখিয়া ॥
নদী গেয়ে গেয়ে সাগরে ধায়।
প্রেমের সুবাস রাখিয়া যায় ॥
এরা যদি প্রেম পারে গো দিতে—পারিব না আমি ?
এরা যদি বিশ্বে পারে ডাকিতে—ডাকিব না আমি ?
তাদের আমি হৃদয়ে রাখিব ;
প্রাণেতে রাখি নয়ন মুছাব।
মুছায়ে আঁখি কাহিনী শুনিব ;
তাঁরি নামে যত দুঃখ ঘুচাব ॥
আমি তারা হব, তারা আমি হবে।
আমি বিশ্ব হব, বিশ্ব আমি হবে ॥
মহাদেব যেন রহিব ঘোর প্রেম পান করে।
বিশ্বে আমাতে পড়িবে বন্ধন অদ্বিতীয় ডোরে ॥

——

দেহাত্মবাদ, দেবতাবাদ ও ঈশ্বরবাদ।*

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার এম-এ, বি-টি)

মানবের ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই একটি বিষম প্রশ্ন মানবমনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। জীবনটা কি বা কিরূপ ? অবশ্য অতি সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে জীবনটা কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারের সমষ্টি। ইহা অতি মূঢ় ব্যক্তিও বুঝে ও অনুভব করে। কিন্তু একটুও উন্মেষিতচিত্ত এই সাধারণ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং কখনও কোনও দেশে পারে নাই ; কারণ, জীবনটা গণ্ডগোলময়। শিশু জন্মিবামাত্রই ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠে আর সারাজীবন সেই কান্না কাঁদিয়া চোখের জলের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করিয়া তবে চুপ করে। যদি বল, জীবনে সুখও ত লোকে অনুভব করে; কিন্তু সে কেবল কান্নার ভেঙ্‌চি মাত্র —দুঃখের তুলনায় সে কতটুকু ? কোন লোককে যেমন বহুদিন ধরিয়া যন্ত্রণা দিতে হইলে তাহাকে মাঝে মাঝে খাইতে ও বিশ্রাম করিতে দিতে হয়, জীবনের সুখও সেইরূপ বহুদুঃখের মাঝে একটু-একটু হাঁপছাড়া মাত্র, নহিলে যে আর সহ্য হয় না, জীবন শেষ হইয়া যায়। কতক লোকের পক্ষে জীবনের সুখবোধটা অতি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ক্যান্সার রোগীর মর্ফিয়ার নেশার ঘোরে আরাম বোধের ন্যায় অতিঘোর ভোগের নেশায় দুঃখের সাময়িক বিস্মৃতি মাত্র। ভোগ স্বভাবতই অস্থায়ী—তাহার অন্তে চাপা দেওয়া দুঃখের জ্বালা শতগুণে উদিত হয়ই হয়। এই দুঃখের তাড়নায় জীব চিরকালই ভাবিতেছে—দূর ছাই ! কেনই বা জন্মেছিলাম, কোথেকেই বা জন্মেছিলাম, জন্মটাই বা কি ? শেষ প্রশ্নটাই মূল—'কিং জন্ম, কিং জীবনম্'। ইহার মীমাংসা যদি হয়, তাহা হইলে অপর অনন্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

জগতের যত মহামন সবাই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এবং তাঁহাদের মীমাংসাসকলই ধর্ম্মমত ও দর্শনমত (religion and philosophy) নামে খ্যাত হয়। এমন কি যাহাকে জড়বিজ্ঞান (material science বা material philosophy) বলিয়া সাধারণতঃ লোকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া ফেলে, তাহারও চরম উদ্দেশ্য এই জন্মতত্ত্ব বা জীবনতত্ত্ব নির্ণয় করা। কিন্তু প্রশ্নটি এত জটিল, মানবমনের স্বাভাবিক হইলেও এত দুরবগাহ্য যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইহার যে ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা জগতের মনীষিগণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করাও শরতের নির্ম্মল আকাশে তারকারাজির সংখ্যা করার ন্যায় অসম্ভব।

প্রকৃতই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"—যাঁহার মত ভিন্ন নহে তাঁহাকে মুনি অর্থাৎ অবাধিতমননশীল (free-thinker) বলা যায় না। ইহা মানবচিত্তের প্রকৃতিগত বিভিন্নতারই ফল। কিন্তু সকল মুনিরই মীমাংসা বা মতবাদকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, আমরা সকল দেহাত্মবাদ বা নাস্তিক্যবাদকে এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারি। জাগতিক জড় পদার্থসকলের জাগতিক শক্তি অনুসারে স্বাভাবিক নিয়মে মিশ্রণের ও পরস্পরের উপর ক্রিয়ার ফলে জন্ম ও জীবন। বৃহস্পতি-চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক পজিটিভিষ্ট, এগ্‌নষ্টিক প্রভৃতি নাস্তিকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত—যদিও অবান্তর বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। ইঁহাদের মতে জ্ঞান শারীরিক জড় উপাদানেরই বিকার, যেমন মাদকতা চিনি গুড় চাউল প্রভৃতি জড়পদার্থের

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী। তং সং

বিকার; সুতরাং দেহ ভিন্ন পৃথক আত্মা বা জীব নাই। দেহ ধ্বংস হইলেই সব ধ্বংস হইয়া গেল। ইহলোকই সব—পরলোক বলিয়া কিছু নাই। পাপ পুণ্য কিছু নাই। নীতি কেবল ইহকালের ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুব্যবস্থা ও সুবিধার জন্য। ইহাই দেহাত্মবাদ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিগণ বলিলেন যে তাহা হইতে পারে না। জ্ঞান কখনও জড়ের বিকার হইতে পারে না; সুতরাং জ্ঞান জড় হইতে ভিন্ন। জড় জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়, জ্ঞান অনুভব ও শাসনের বিষয় হয়। অনুভূত জড়ের পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস হইলে জ্ঞানের ধ্বংস হয় না। সুতরাং দেহের ধ্বংস হইলে দেহের অনুভাবক জ্ঞানের অর্থাৎ জীবের ধ্বংস হয় না। ইহকালের পর পরকালে সে থাকে। পুনশ্চ, জড় মাত্রই জ্ঞানদ্বারা চালিত হয়; সুতরাং জগতে যেখানে যত ব্যষ্টি ও সমষ্টি জড় আছে সকলেরই পরিচালক বা শাসক জ্ঞান আছে। এইরূপে সূর্য্যের শাসক সূর্য্যদেবতা, চন্দ্রের শাসক চন্দ্রদেবতা, বায়ুর শাসক বায়ুদেবতা, জলের শাসক জলদেবতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে অনন্ত জগতে অসংখ্য দেবতাজীব আছেন। যে জীবের বা দেবতার শাসিত বা অধিষ্ঠিত জড় যত স্থায়ী, সেই দেবতার জীবনও তত স্থায়ী। সুতরাং পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতির দেহের অনুভাবক জীবের জীবন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির জীবন অতি বৃহৎ। যে সকল উপাদানে ক্ষুদ্র জীবের দেহ গঠিত ও যে সকল পদার্থের উপর তাহার জীবন নির্ভর করে, সেই সকল উপাদানের ও পদার্থের শাসক বড় বড় দেবতার দয়া ও সাহায্য ভিন্ন তাহার ইহকালে বা পরকালে শ্রেয়োলাভের কোনও উপায় নাই। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এই সকল দেবতার পূজা, অর্চ্চনা, ভোগ, বলি, স্তব, স্তুতি করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করাই মঙ্গলার্থী মানবের কর্ত্তব্য। ইহাই দেবতাবাদ। এই বাদের বহু স্তর আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কালের মনোবিকাশ অনুসারে এই দেবতাবাদ অতি মূঢ়ভাব হইতে বহু মার্জ্জিত ভাব পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছে। আমাদের দেশের অতি প্রাচীন কালের যাগযজ্ঞাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যাগযজ্ঞাদি, গ্রীস ও রোমদেশের প্রাচীন জুপিটার প্রভৃতি দেবতার পূজা, প্রাচীন মিশরবাসীদিগের আসিরিস্ আইসিস্ প্রভৃতির পূজা, এসিরিয়া বাবিলোনিয়া দেশের প্রাচীন কালের অসুরাদি দেবতার অর্চ্চনা, প্রাচীন কালের ইহুদিদিগের মলক প্রভৃতি দেবতার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া অসভ্য জাতিদিগের সূর্য্য চন্দ্র ভূত-প্রেত প্রভৃতির পূজা পর্য্যন্ত এই দেবতাবাদের অন্তর্গত। এই ভারতীয় আর্য্যভূমিতে দেবতাবাদ যত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আর কুত্রাপি তাহা করিতে পারে নাই।

তৃতীয় শ্রেণীর মুনিগণ নির্ণয় করিলেন যে, সমগ্র জগতের একমাত্র দেবতা স্রষ্টা, পালয়িতা, শাসয়িতা ও সংহর্ত্তা। এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী জগতের জীবরূপী ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলির প্রভু—পিতা। হৃদয়ের পবিত্রতা, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, প্রেম, ইহকালের ভোগবিরক্তি প্রভৃতি তাঁহাকে আরাধনা করিবার প্রধান উপকরণ এবং এই সকল সদ্‌গুণের অভ্যাসেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। এই সকল সদ্‌গুণে ভূষিত হইলে ও আন্তরিক ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে এই ঈশ্বরকে ভাবনা করিলে জীব অনন্তকালের জন্য তাঁহার সন্নিধানে বাস করিয়া অনন্ত সুখ ভোগ করে। ইহাই ঈশ্বরবাদ। খৃষ্টান ও মুসলমানধর্ম্মে দেবতাবাদকে নিরাশ করিয়া ঈশ্বরবাদ স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে স্পষ্টতঃ দেবতাবাদকে নিরাশ না করিয়াই ঈশ্বরবাদ চলিয়াছে। তবে ঈশ্বরোপাসনা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে বলিলে হয়; কেহই আর দেবতা-পূজাকে উচ্চ স্থান দেন না। ঈশ্বরোপাসনাও এদেশে বহু আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা প্রভৃতি সূক্ষ্মাবতারের ও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি স্থূলাবতারের উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার অন্তঃপাতী করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মূলতত্ত্ব এই যে, জড় ব্যতীত চৈতন্য আছে। এই চৈতন্য মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্, দেবতা, ঈশ্বরের মধ্যে আসিয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বর-চৈতন্য মহান্, অন্যান্য চৈতন্য ক্ষুদ্র। জড়ের সহিত চৈতন্যের নিত্য সম্বন্ধ। জড় ভোগ্য ও শাসিত, চৈতন্য ভোক্তা বা শাসয়িতা। জীব পৃথিবীতে সুখ-দুঃখই ভোগ করুক, আর নরকে নিরন্তর দুঃখই ভোগ করুক, আর বেহেস্তে, প্যারাডাইজে, স্বর্গে, গোলোকে, বৈকুণ্ঠে, কৈলাসে, মণিদ্বীপে, ব্রহ্মলোকে নিরন্তর সুখই ভোগ করুক—সে ভোক্তা এবং তাহার বাহিরের জগৎ সে ভোগ করে, আর ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি তাহাকে ও জগতকে শাসন ও ভোগ করেন। জড় ও চৈতন্যের এই সম্বন্ধের ফল সুখ-দুঃখে ভেদ হইতে পারে, অর্থাৎ সুখ না হইয়া দুঃখ হইতে পারে কিম্বা দুঃখ না হইয়া সুখ হইতে পারে অথবা সুখ-দুঃখ উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু একেবারে এই সম্বন্ধের উচ্ছেদ অর্থাৎ সুখদুঃখ উভয়েরই অভাব হইতে পারে না। সুতরাং দুঃখী চৈতন্যের এবম্বিধ কার্য্য করা উচিত যাহাতে সে জন্মমৃত্যু জরাব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোন একান্ত সুখময় স্থানে নিরন্তর অব্যাকুলিত ভাবে অনন্তকাল সুখভোগ করিতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণীর মুনিগণ এই মতের বিরোধ করিয়া বলিলেন—বাপু হে, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা যদি হইতে পারিত, তবে বড় মজাই হইত সন্দেহ নাই। সোণার স্বর্গে, সোণার বাড়িতে, সোণার আসনে বসিয়া সোণার থালায় করিয়া অটুট নিরাময় দেহে সুখভোগ করিয়া ও পারিজাতের মালা পরিয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া অনন্ত কাল বেড়ান যদি যাইত, তাহা হইলে আর কি চাই? কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। অনন্ত সুখভোগের কল্পনাটাই একেবারে ভ্রান্ত। সুখ-দুঃখ অন্যোন্যসাপেক্ষ বোধ, অর্থাৎ সুখবোধ না থাকিলে দুঃখবোধ হয় না ও দুঃখবোধ না থাকিলে সুখবোধ হয় না। জগৎ সুখদুঃখের মিশ্রিত পদার্থ—উহা অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ দিতে পারে না; সুতরাং অনন্ত নরকের ধারণাও যেমন ভুল, অনন্ত স্বর্গের ধারণাও তেমনি ভুল। আমাদের চিত্ত কিনা বড় ভোগমুখী, ভোগলালসায় পরিপূর্ণ, তাই আমরা অনন্ত স্বর্গবাসের ধারণাটাকে খুব আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই—উহা আমাদের সুখলালসার বড় অনুকূল। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, সুখলালসাটা নাই—মন আর সুখভোগের জন্য, আতরগোলাপের জন্য, মনোহর গীতবাদ্যের জন্য, সুখাবহ স্পর্শ ও বিমোহন দৃশ্যের জন্য আদৌ লালায়িত নহে—তখন কি আর স্বর্গটা একটা বিশেষ কিছু লোভনীয় বস্তু হইবে? যদি বল যে মন এমন হইতে পারে না, তাহা হইলে সুখের পর দুঃখ তোমার আসিবেই আসিবে এবং সুখও অল্পবিস্তর দুঃখমিশ্রিত হইবেই। দেখ, ভোগ্য পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। যাহার আরম্ভ আছে তাহারই শেষ আছে। যাহা অনন্ত তাহা অনাদি, তাহার আরম্ভ বা শেষ কিছুই নাই। আরম্ভবিশিষ্ট অনন্ত কথাটাই বাতুলের প্রলাপ। সুতরাং স্বর্গবাসের যখন আরম্ভ আছে তখন স্বর্গবাসের অন্তও আছে।

ভারতের বাহিরে কোথাও এ মত প্রস্ফুটিত হয় নাই। অন্য সর্ব্বত্র স্বর্গসুখই নিত্য এবং স্বর্গলাভই জীবের চরমোৎকৃষ্ট গতি। এই ভারতের আর্য্যভূমিতেই অনন্ত স্বর্গ-নরকবাদ নিরস্ত হইয়াছে। স্বর্গ-নরক উভয়ই জগতের অন্তঃপাতী; উৎপত্তি-বিনাশশীল জগতের সহিত জীবের যতদিন সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন তাহার আত্যন্তিক অর্থাৎ চিরতরে কল্যাণ নাই। ভূর্লোকেই হউক, ভুবর্লোকেই হউক, স্বর্লোকেই হউক বা যে কোন লোকেই হউক জীব জন্মমৃত্যুর দ্বার দিয়াই সেখানে উপনীত হয়, সুতরাং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে নিষ্কৃতি নাই। এ নিষ্কৃতি পাইতে হইলে তাহাকে চিরতরে জগৎসম্বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। ইহাই হইল মুক্তিবাদ।

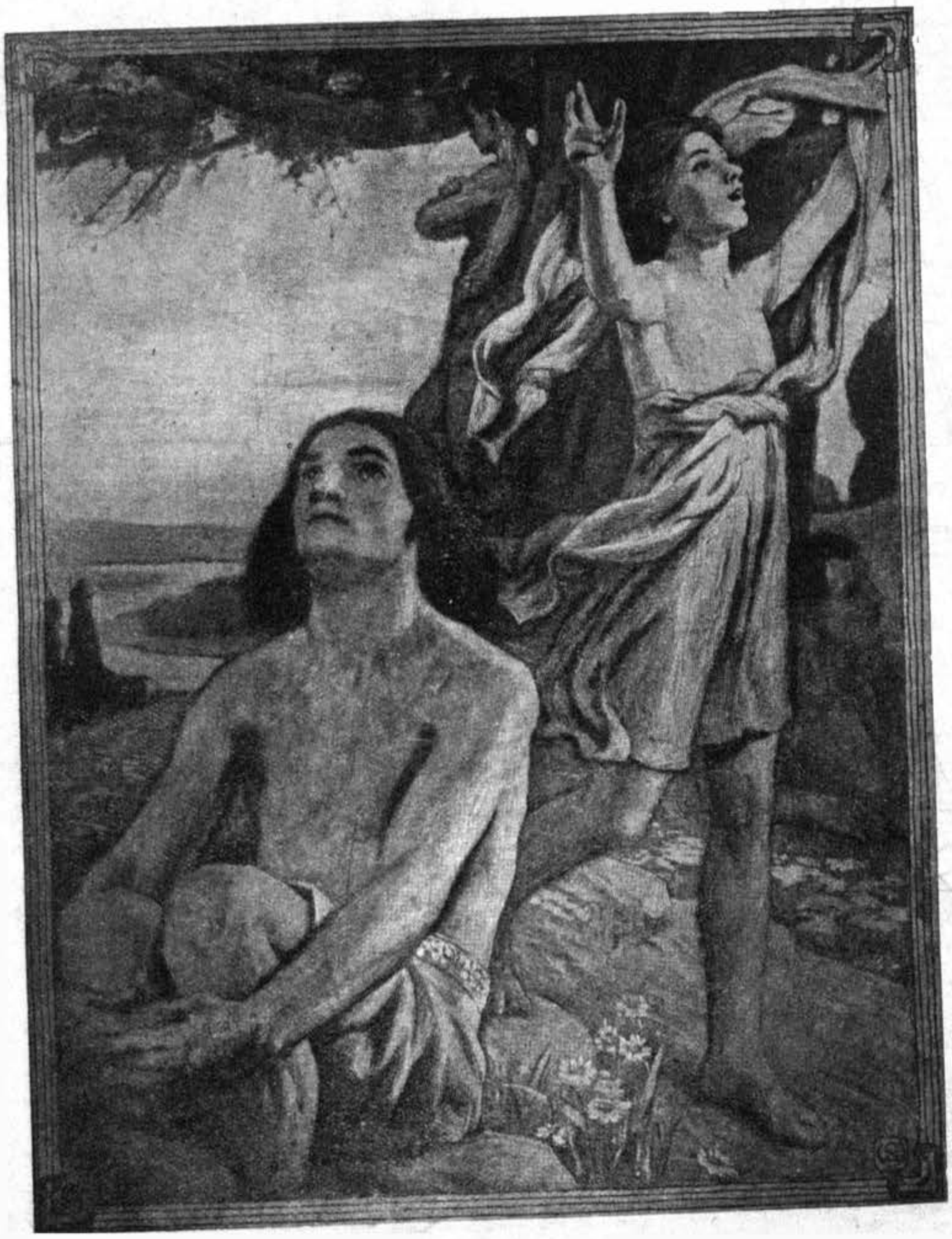
শোক-সংবাদ।

পরলোকে রাজমাতা আলেকজান্দ্রা।

আমাদের এবারের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় মর্ম্মভেদী সংবাদ পাইলাম যে, গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার সায়াহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় আমাদের মহামাননীয়া রাজমাতা আলেকজান্দ্রা ইংলণ্ডের স্যাণ্ড্রিংহাম রাজ-প্রাসাদে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি কিছুদিন যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। আমরা ইঁহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি এবং রাজ-পরিবার-বর্গের এই শোকে প্রগাঢ় সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺তারিণীচরণ গুপ্ত—আদিব্রাহ্মসমাজের আজীবন হিতৈষী বন্ধু,প্রাচীন যুগের উৎসাহী ব্রাহ্ম তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয় গত ২৯শে কার্ত্তিক রবিবার ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ৪॥০ ঘটিকায় তাঁহার কলিকাতার বাসাবাটী ২৫।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে পুত্রপৌত্রাদি বেষ্টিত হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ বার্দ্ধক্যবশতঃ ইঁহার শরীর ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম একসপ্ততিবর্ষ হইয়াছিল। শ্রীরামপুর ইঁহার জন্মভূমি। যৌবনে ইনি শ্রীমন্মহর্ষিদেবের নিকট দীক্ষিত হন এবং উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মপ্রচেষ্টায় অচিরে শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা হইয়া উঠেন এবং আজীবন তাহার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। মহর্ষিপরিবারের সহিত ইঁহার যে দীর্ঘকালের প্রীতির সুদৃঢ় যোগ ঘটিয়াছিল—ইঁহার মৃত্যুতে তাহার অবসান হয় নাই—তাহা এখনও ইঁহার পুত্র-পৌত্রাদির মধ্য দিয়া বহমান হইতেছে। এই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থটী'র নিভৃত অন্তরের নিগূঢ় সাধনা ও সুকৃতি যেখানে অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে, ইনি ব্রাহ্মসমাজকে সেই আপন ধর্ম্মপ্রাণ পরিবারের সেবা ও সাহচর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শোকার্ত্ত পরিবারের অন্তরে সান্ত্বনাদান ও লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

৺সারদারঞ্জন রায়—'বিদ্যাসাগর কলেজের' অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় মহাশয় গত ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দেওঘরে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের গণিতে ও সংস্কৃতে বিদ্যাবত্তার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ব্যায়ামানুরাগই ইঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদেশে সাধারণতঃ যাঁহারা দেহের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা মনের অনুশীলনে অগ্রসর হন না; আবার যাঁহারা মনের অনুশীলনে রত, তাঁহারা দেহচর্চ্চায় পশ্চাৎপদ; কিন্তু সারদারঞ্জনে এই বিরোধ ভঞ্জন হইয়াছিল—তিনি উভয়েরই চর্চ্চায় সমান মনোযোগী ছিলেন। ইহারই ফলে তাঁহাতে যে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার সম্মিলন ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত পুত্র-পরিজনদিগকে আমাদের হৃদয়ের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।



স্বাস্থ্য-অর্জ্জন

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৯ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

স্বাস্থ্য অর্জ্জন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মানুষ যখন দেশের আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়; তখন তাহার বন্ধুগণ ও তাহার সমাজ তাহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভগবানেরই আদর্শের বিরুদ্ধে চলিতে চায়, তখন সে রোগে নিপতিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সে নিজেকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র বিবেচনা করিবার পরিবর্ত্তে মনে করে যেন, তাহার উপর কত অত্যাচার অবিচার করা হইয়াছে; এবং যাহাকে সম্মুখে পায় অথবা যে তাহার কাহিনী শুনিতে বিরক্তি বোধ না করে, অন্ততঃ মুখে বিরক্তি প্রকাশ না করে, তাহারই নিকট সে নিজের মন্দ-ভাগ্য ও দুরবস্থা বর্ণনা করিতে বিরত হয় না।

মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে—সুস্থ থাকিবে, সুখী থাকিবে এবং ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে বলিয়া। মানুষ যদি নিজেকে সুখী রাখে, তবে ষোল আনা সম্ভাবনা যে, সে সুস্থ থাকিবে; আর সুস্থ থাকিতে গেলেই তাহাকে ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেই হইবে।

জগতে স্বাস্থ্য হইল সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক পদার্থ। প্রকৃতি স্বয়ং এবিষয়ে আমাদের সহায়। স্বাস্থ্য হইল প্রকৃত সামঞ্জস্য, প্রকৃতির সকল শক্তিই সেই সামঞ্জস্য রক্ষার্থ উদ্যুক্ত। আজকাল অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন না যে, তাঁহারা রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া আরোগ্যদান করিতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের পথে রোগীকে পরিচালিত করা মাত্রেই তাঁহাদের ক্ষমতা ও শক্তি পর্য্যবসিত। আরোগ্য দান করে প্রকৃতিই; নীরোগ করিবার সকল শক্তি প্রকৃতিরই নিকট খুব সহজ ও স্বাভাবিক।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল যে আমরা জানি না তাহা নহে। এতটুকু সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি যাহারই আছে, সেই তো সেই সমস্ত নিয়ম জানে। দুঃখের বিষয়, অনেকে সেই সকল নিয়ম সকলের পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক না ভাবিয়া সেগুলিকে ব্যতিক্রমস্থল মনে করে। সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে আজ না হউক দুদিন দশদিন পরে যে শাস্তি পাইতেই হইবে, সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিজেদের শাস্তিলাভের পথ উন্মুক্ত করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি কেবল জানিয়া রাখিলে চলিবে না, কেবল মুখস্থ করিলেও চলিবে না; আমাদের কর্ত্তব্য—সমস্ত হৃদয়-মন দিয়া সমস্ত শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল নিয়ম অনুসারে জীবনযাপন করা। নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার কৌশলেরই আমাদের অভাব; আসলে সেই নিয়মগুলি পালন করিবার অভ্যাস আমরা অর্জ্জন করি না।

আমাদের জানা উচিত যে, স্বাস্থ্যের মূলে প্রকৃতির মঙ্গল নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিবার অভ্যাস রাখা চাই। এ অভ্যাস যে কেহ রাখে না, তাহা নহে। রাশি রাশি লোক এই অভ্যাস অর্জ্জন করে, ইহা তো আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যেক দিন সকল সময়েই যাহাতে সুস্থ থাকিতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখে। যে সকল নিয়ম তাহারা সহজে পালন করিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতে সেগুলি প্রকৃতির অনুকূলই বটে।

স্বাস্থ্যলাভ করিবার, নিজেকে সুস্থ রাখিবার মূলমন্ত্র হইতেছে—স্বাস্থ্যকেই ধ্যান কর, আরোগ্যকেই সর্ব্বদা আবাহন কর,—অস্বাস্থ্যকে নহে, রোগকে নহে। স্বাস্থ্যের আদর্শের প্রতি তোমার লক্ষ্য ও দৃষ্টি স্থির রাখ এবং তুমি আপনাকে যে প্রকার সবল, সুস্থ, সুখী ও আত্মনির্ভরশীল দেখিতে চাও নিজে সেই প্রকার হইয়াছ, তাহাই মনে সর্ব্বদা চিন্তা কর; প্রাণের ভিতর তোমার নিজেকে সেই প্রকার আদর্শ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করিয়া দেখিতে থাক।

স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্বপ্রধান সহজসাধন হইতেছে—মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সম্ভবমত ভিতরে টানিয়া লও; সম্ভবমত তাহা কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখ এবং সম্ভবমত ধীরে ধীরে নাসিকার দ্বারা সেই টানিয়া রাখা বায়ু বাহির করিয়া দাও। এইজন্যই প্রাণায়ামকে হিন্দুরা সন্ধ্যাহ্নিকের অঙ্গরূপে ধরিয়া লন। প্রাণায়াম অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে খোলা জায়গায় গিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর নিশ্বাস-প্রশ্বাস করা অধিকতর সহজ বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ, আমাদের জীবনধারণের জন্য যতটুকু আহার করা আবশ্যক, তদপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয় অংশ অধিক আহার করি। সেই এক তৃতীয় অংশকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট বলক্ষয় ও বৃথা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমাদের চিকিৎসক ও যোগোপদেষ্টাগণ বহু পূর্ব্বে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; এইজন্য আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, উদরের অর্দ্ধেক আহার্য্য দ্রব্যে, সিকি অংশ জলে এবং সিকি অংশ বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করিবে; তাহা হইলে রোগের সম্ভাবনা থাকিবে না।

স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার প্রধান উপায় হইতেছে ভয়। ভয় হইলেই রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চলন থাকে না—ব্যতিক্রম ঘটিবেই। রক্তসঞ্চলনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়; এবং পরিপাক শক্তির নূন্যতা ঘটিলেই জীবনের সমস্ত কার্য্যপ্রণালীর উপর আঘাত পড়ে। ভয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিলে খুব গভীর রূপে নিশ্বাস লইবে এবং আহার কমাইয়া দিবে। কার্য্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে; আলস্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে; সকলের গুণ গ্রহণ করিবে ও সকলকে প্রশংসা করিবে; অপরের দোষ বাহির করিতে অগ্রসর হইও না, বৃথা ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইও না, সকলকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে শিক্ষা কর, সকলকে ভগবানের সন্তান জানিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করিবার অভ্যাস অর্জ্জন কর। সর্ব্বদা সুস্থ লোকদিগের সহিত আহারবিহার কর। স্বাস্থ্য সংক্রামক জানিও। *

এইখানে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় দু-একটী প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করি—

আঁতে তিতো (তিক্ত) দাঁতে নুন (লবণ)।
ভাত খায় তিন কুণ (৺) ॥
চোখে জল (ধৌতি) কানে তেল।
বৈদ্য চায় ভেল ভেল ॥
হয় না হয় দুইবার যায় (শৌচে)
খায় না খায় সকালে নায় (স্নান করে)
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায় ?

উৎসবে আহ্বান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে ভগবান! আজ তোমার মঙ্গল নামে আমাদের সকলের মনপ্রাণ জাগিয়া উঠুক। জগতের চারিদিকে মহাজাগরণ জাগিয়া উঠিয়াছে—আমরা কি সেই জাগরণের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি

* "স্বাস্থ্যসমাচার"—শ্রাবণ—১৩৩২ হইতে উদ্ধৃত।

করিব না? আমাদের হৃদয়ে কি সেই জাগরণ এতটুকু সাড়া আনিবে না? দেশের মধ্যে তোমার আবির্ভাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। তুমি ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়াও দেশের প্রাণে তড়িৎস্পন্দন জাগাইয়া তোল। পরাধীনতা, দাসত্ব দেশের জীবনের প্রতি অক্ষরে লিখিত দেখি। দাও প্রভু—দাও—দেহে বল দাও, শক্তি দাও, মনে প্রাণে বীর্য্য দাও, তেজ দাও, যাহাতে বাঁচিতে পারি—প্রভু বাঁচিতে পারি। আমরা তোমার আদেশ অমান্য করিয়া নানাবিধ অনাচার কদাচারের দ্বারা নিজেদেরই কঠোর নিগড় প্রস্তুত করিয়াছি। এখন, হে দয়াময়! তোমারই করুণা ভিক্ষা করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার বজ্রের দ্বারা সেই নিগড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও। আমাদের হৃদয় তোমার প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া দাও, যাহাতে মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা না করি, যাহাতে মানুষকে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া না রাখি। আজ আমাদের মন-প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সুহৃৎ। তুমি আমাদের নিত্য সঙ্গীরূপে থাকিয়া আমাদিগকে সত্যধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দাও এবং সেই পথে পরিচালিত কর।

বন্ধুগণ! জাগিয়া ওঠ—চারিদিকে দেখ, সত্যই তাঁহার আহ্বানের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। নির্ভয় হও—তাঁহার আদেশে সংগ্রামে অবতীর্ণ হও—ধর্ম্মসংগ্রামে প্রাণপাত হইলেও ত্রিলোকজয়ী হইবে এবং ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিবে। প্রাণের ভিতর মঙ্গল ব্রত গ্রহণ কর; ক্ষণেকের জন্যও কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা বা অমঙ্গলের ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিও না। ভগবানের অজেয় পতাকা স্কন্ধে বহন কর এবং তাঁহার আদেশ পালনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। সত্যেতে, জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে কর্ম্মেতে আপনাকে সমুন্নত কর। মন হইতে ভগবানের প্রতি সংশয় সমূলে উৎপাটিত কর এবং আত্মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তোল। তাঁহার কর্ম্মে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যদি তুমি আপনাকে নিয়োগ কর, তবে সেই ধর্ম্ম-অর্থ-কামভরণ ত্রিভুবনপতি তোমার সকল ইচ্ছা সকল কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। তাঁহাকে ডাক—প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাক—তাঁহার অনিমেষ নয়ন সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখিয়া, তাঁহার নিশ্চল মঙ্গলভাব অন্তরে অনুভব করিয়া নির্ভয় হও। তিনি তোমার পাপতাপ দুঃখশোক সমস্তই হরণ করিবেন এবং তোমাকে শুভসম্পদে নিশ্চয়ই সমুন্নত করিবেন।

ঘাতপ্রতিঘাত ও গঠন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

পাশ্চাত্য আলোক যখন তীব্রভাবে এদেশের উপর পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতে সকল বিষয়ে বিপ্লবের ভাব চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ধর্ম্মের দিক দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটিল। তিনি এক দিকে স্বাধীন চিন্তা দ্বারা অপর দিকে সুগভীর শাস্ত্রালোচনার প্রভাবে ধর্ম্মক্ষেত্রে যে নব উন্মেষ আনয়ন করিলেন, তাহাতে তিনি যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় এমন কেহ ছিলেন না, যিনি তাঁহার প্রতিভার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন। তখনকার ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁহার মতের অনুযাত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মতের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে-নিজেই অল্পাধিক শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিবাহাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইতে হইলেও অন্যান্য বিষয়ে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেন। এক ভাবে বলিতে গেলে দেশীয় শাস্ত্রবিদ্‌গণের আসন টলিয়া গেল। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া সামাজিক ব্যাপারে ও আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু-জাতির হাল ধরিয়া আসিতে ছিলেন, তাঁহারা কতকটা নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন।

রামমোহনের পরবর্ত্তী সময়ে—অবশ্য কয়েক বৎসর পরে—ব্রাহ্মসমাজের ইংরাজিশিক্ষিত প্রচারক ও আচার্য্যগণ চারিদিকে সুযুক্তি সহকারে বিশেষ বাগ্মীতার সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সরল ও সহজ যুক্তির সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেন না। চারিদিকে

শাস্ত্রবিরহিত স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে তৎসময়ে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি বাগ্মীতা প্রভাবে জনসাধারণকে ধরিয়া রাখিতে পারেন। বাঙ্গালা ভাষায় অনেকে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বর্ণাশুদ্ধিবহুল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'ভাষপত্র' বা তাঁহাদের যৎসামান্য রচনা জনসাধারণের বিদ্রূপ উৎপাদন করিত। তাঁহাদের যে যোগ্যতা ছিল না একথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া আপনাদিগকে তুলিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ দৈন্য নিতান্ত বহুদিন ধরিয়া চলে নাই। এই আঘাত পাইয়া প্রতিঘাত ফলে পরবর্ত্তী সময়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও কয়েকজন বৈষ্ণবচূড়ামণি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় আবার প্রাচীন ভাবের দিকে অনেককে সমাকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে সম্মান ও আসন হারাইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে আবার তাঁহারা সে আসন কতক পরিমাণে লাভ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহারা যে সম্মান পাইয়াছিলেন বা অনেকে আজকাল পাইতেছেন, তাহা শাস্ত্রের শাব্দিক ব্যাখ্যা দ্বারা নহে কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা, এবং প্রচলিত ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত অর্থের কথা বুঝাইয়া। তাঁহারা এখন মতে ও বিশ্বাসে উদার হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রের ভিতরে প্রক্ষিপ্তবাদ স্বীকারেও কুণ্ঠিত নহেন। শিক্ষিতগণের মধ্যেও যাঁহারা অতিরিক্ত যুক্তি ও বিবেক প্রভাবে কতকটা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারাও আপনাকে ও আপনার দেশকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের জাতীয় চরিত্র ঘাতপ্রতিঘাতে ভিতর দিয়া সুগঠনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বহুদিন হইতে এ দেশের জমিদারসম্প্রদায় সমাজের নেতার আসন গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব থাকিলেও তাঁহারা আপনাদের উদারতায়, ভদ্রতায়, বিনয়ে ও দানে সকলকে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থের আধিক্য জন্য তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভূরি দানে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে তাঁহারা বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন; এবং নিমন্ত্রণাদির বিপুল আয়োজনের ফলে নিজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পর্য্যন্ত সকলেই জমিদারের বশতাপন্ন ছিল। তদুপরি জমিদারগণ অভাব নিবন্ধন আজকালকার মত অত্যাচারী ছিলেন না। বিনয়ে ও উদারতায় তাঁহারা সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন। ইংরাজ-শাসনের মধ্য আমলে জনসাধারণ যে ভাবে সুশিক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল, জমিদার বা ধনশালীগণ সে ভাবে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অগ্রে সকলেই জমিদারের দ্বারস্থ ছিল। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষা পাইয়া কেহ উকীল, কেহ বা উচ্চপদস্থ হইয়া যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আবির্ভূত হইলেন, তখন জমিদারগণকে বাধ্য হইয়া নিজ মর্য্যাদা কতকটা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের সকাশে মধ্যে মধ্যে যাইতে হইল। বৈষয়িক ব্যাপারে যে তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, মনে মনে সে হীনতা স্বীকার করিতে হইল। পূর্ব্বে প্রতি জমিদারের বাটীতে মাহিনা করা নিজস্ব কবিরাজ থাকিত। তাঁহারাই জমিদারের আজ্ঞাধীন থাকিয়া মোটামুটি সর্ব্ববিধ চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ডাক্তারি শিখিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসায় নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন, জমিদারগণ বাধ্য হইয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে শিক্ষিতগণ ক্রমে অশিক্ষিত জমিদারগণকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। উকীলগণের প্ররোচনায় অর্থাগমের পথ আরও সুপ্রশস্ত করিবার জন্য জমিদারগণ প্রজাগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। জমিদার ও প্রজার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ তিরোহিত হইল। জমিদারগণও বিলাসিতার নানা অভাবে প্রপীড়িত হইয়া, তদুপরি সরিকগণকে প্রাপ্য অর্থ দিতে গিয়া পূর্ব্বের ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে হস্ত সঙ্কোচন করিতে বাধ্য হইলেন; কাজেই তাঁহারা অর্থাভাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের উপরে ও আপনার সমাজের উপরে পূর্ব্বপ্রভাব আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতরে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে কতকটা ওজস্বিতার ভাব

চারিদিকে স্বভাবতঃ আসিয়া গেল। আজকালকার দিনে গুরু-লঘুর বিচার বিলুপ্তপ্রায়। কেহ কাহাকে মানিয়া চলিতে চাহে না। জমিদারে-প্রজায় ও শিক্ষিত-অশিক্ষিতের পরস্পর মিলনের সে মধুর ভাব ক্রমে খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে।

এই ঘাতপ্রতিঘাত ভিতর দিয়া আবার গঠনের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। জমিদারবর্গের ভিতরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ববাসন কতকটা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অর্থের আধিক্য দেখাইয়া নহে, কিন্তু নিজে শিক্ষিত হইয়া এবং শিক্ষিতগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ও তাঁহাদের সহিত যোগরক্ষা করিয়া। আজকালকার দিনে aristocracy অর্থাৎ কৌলীন্য-গর্ব্ব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। পরস্পরে মিলিত ভাবে কার্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই আজ আমরা জমিদারগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের মত দার্শনিক ও রবীন্দ্রনাথের মত কবি পাইয়াছি। পূর্ব্বে 'রাজা' বা 'মহারাজা'-আখ্যাধারী বড় বড় ভূস্বামী নিজে দেওয়ানজির উপরে সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন; কিন্তু সে দিন আর নাই। আজকাল জমিদারগণের মধ্যেও বিষয়বুদ্ধি বাড়িয়া চলিতেছে। এক সময়ে জমিদারগণ সমাজের ও দেশের নেতা ছিলেন। মধ্যে শিক্ষার অভাবে তাঁহারা বিপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান গঠনমূলক সময়ে আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা আবার তাঁহাদের নষ্টগৌরব ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজকালকার সভাসমিতিতে মহারাজা দ্বারভাঙ্গা, মহারাজা বর্দ্ধমান, মহারাজা নাটোর, মহারাজা কাশিমবাজার প্রভৃতিকে সভাপতিরূপে না পাইলে সভা যেন অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। মধ্যে আমরা আমাদের দেশের জমিদারগণকে যে অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম, আবার আমরা তাঁহাদিগকে সেই নেতৃত্ব প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছি—কেবল তাঁহাদের শিক্ষার ও সুচরিত্রের গুণে। এখানেই বিপ্লবের ভিতর দিয়া আবার গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বে বড় বড় রাজা বা জমিদারগণের সভায় সভাপণ্ডিত থাকিতেন। আজকাল রুচিভেদে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহা যে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তাহা বলা বাহুল্য। রাজা বা জমিদার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের জীবিকার ভার গ্রহণ করিতেন। কাজেই উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার স্রোত দেশের ভিতরে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইত। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অভাবের বিভীষিকা সন্দর্শনে পুত্রগণকে ইংরাজি শিক্ষা দিতেছেন। সংস্কৃত আলোচনার পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভট্টপল্লীর অনেক অধ্যাপক-পণ্ডিতের পুত্র আজকাল ইংরাজী শিখিয়া আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপে বংশক্রমাগত সংস্কৃত শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। যজমানগৃহের ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠানের অভাবে পুরোহিতের অবস্থা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। উহার ফলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের গৃহে অভাবের হাহাকার উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজকাল টোল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে, গবর্ণমেণ্টও সাহায্য প্রদান করিতেছেন, কিন্তু ঈদৃশ টোল হইতে গবর্ণমেণ্ট-উপাধিপ্রাপ্তগণের ভিতরে পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষার প্রসারতা পরিলক্ষিত হইতেছে না। যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে মনে হয়, সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে সংস্কৃতভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কার্য্যের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়। এ ক্ষেত্রে গঠনের পরিচয় বিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে না।

রাজা রামমোহন রায়ের পরে রাজা রাধাকান্ত দেব স্বীয় ঔদার্য্যগুণে 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে প্রকাণ্ড অভিধান বাহির করিয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। ইহার সংরচনে কত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অন্নের সংস্থান হইয়াছিল। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যে দানশীলতার কৃতিত্ব রাখিয়া গেলেন তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। বিদ্যোৎসাহী বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহতাপচাঁদ মহাভারত-অনুবাদে ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশে ও বিনামূল্যে বিতরণে যে দানশীলতার পরিচয় দিলেন, আজকালকার দিনে সেই উদারতার তুলনা কোথায়

মিলিবে ? ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ অনুবাদসহ বাহির হইয়াছিল, তাহা অনেকে জানেন। কলিকাতার কয়েকজন ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক পরিবার হইতে বহু ব্যয়ে বৈষ্ণবগ্রন্থাদি অনূদিত, প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহাদের গৌরব নিতান্ত অল্প নহে। এই রূপে কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উৎসাহ ও আর্থিক আনুকূল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজকালকার বিপ্লবের দিনে বিবিধ বিলাসে ও বহুমূল্য গৃহসজ্জা-সংগ্রহে ধনীর অর্থ নিঃশেষিত; সুতরাং প্রাগুক্তরূপে বড়মানুষি দেখাইবার ও দেশের কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রেও গঠন কার্য্যের সেরূপ পরিচয় মিলিতেছে না।

পূর্ব্বে জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শিক্ষার আধিক্য না থাকিলেও অনেকের রচিত সঙ্গীতে তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি ও হৃদয়ের গভীর অনুরাগ দেখা যাইত। তাহাদের অনেকগুলি বড় মধুর, বড় প্রাণস্পর্শী। তাঁহাদের ভিতরে চরিত্রহীনতার বড় আভাস পাওয়া যাইত না। নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনা ও দেবপূজা, মন্দির ও জলাশয়প্রতিষ্ঠা, অতিথিসৎকার ও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন—ইহাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যীভূত ছিল। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রচুর তৈজস-পত্র প্রতি ব্রাহ্মণ গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী ছিল। কিন্তু এরূপ দানের ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ের গণনায় অপব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আশ্রিতপ্রতিপালনের ভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। জমিদার ও ধনাঢ্যের হৃদয় দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে বিপ্লব দেখিতেছি; গঠনের হস্ত পরিলক্ষিত হইতেছে না।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখিতে পাই শ্রদ্ধেয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও পরে রাজা রমানাথ ঠাকুর জমিদারগণের ভিতরে ইংরাজি শিক্ষায় ও আইন জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। এক সময়ে দ্বারকানাথের অসামান্য প্রতাপ ও আধিপত্য ছিল। তাঁহার মত সূক্ষ্মদর্শী ও বিষয়ী লোক অল্পই ছিলেন। আইনে অভিজ্ঞ বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার তাঁহার মুখাপেক্ষী ছিলেন। তখনকার দিনে বঙ্গে এমন কোন জমিদার ছিলেন না, যিনি দায়ে পড়িলে দ্বারকানাথের সংস্পর্শে না আসিতেন। তাঁহার বেলগাছিয়া বাগান স্বয়ং লাট অকলণ্ড ও এলেনবরা হইতে আরম্ভ করিয়া সংভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় রাজা-মহারাজার বিহারভূমি ছিল। তিনি নিজের বাহুবলে ও অসামান্য প্রতিভায় এত বিষয়-সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, বিলাতে যাইবার সময় পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া গেলেন—"বিষয়ের আয় যাহা রাখিয়া গেলাম তাহা প্রায় বর্দ্ধমান মহারাজের অনুরূপ; খুব সাবধান হইয়া চলিবে।" প্রসন্নকুমারও আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজা রমানাথ বহুদিন ধরিয়া British Indian association এর সভাপতি ছিলেন। উত্তরপাড়ার সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাণ্ড পুস্তকালয় তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় আজও দান করিতেছে। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, ইঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও ইঁহাদের আদর্শ, আলস্যপ্রিয় জমিদারগণের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথম চাঞ্চল্য ও কার্য্যতৎপরতার ভাব আনিয়া দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে চতুষ্পাঠীতে গুরু ও শিষ্যগণের মধ্যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার ভাব প্রগাঢ় ছিল—আজও আছে। যখন বিদ্যালয়ে পড়ি, তখনও সে ভাব দেখিয়া আসিয়াছি। আজও কতকটা রহিয়াছে। কিন্তু কলেজে আসিয়া দেখি, অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইতেন—ছাত্রগণের আর কোন সন্ধান রাখিতেন না; ছাত্রানুরাগের পরিবর্ত্তে ছিল কঠোর শাসনের ভাব। আজকালকার দিনে ছাত্র-বাহুল্য নিবন্ধন প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের স্নেহপ্রদর্শন কঠিন, ইহা আমরা বুঝি। কিন্তু অধ্যাপক ইচ্ছা করিলে ছাত্রগণের সঙ্গে কঠোর বা উদাসীন ভাবের পরিবর্ত্তে কতকটা মধুরভাব সংস্থাপন করিতে পারেন। অবশ্য আজকাল এদিকে কতকটা চেষ্টা চলিতেছে। সেদিন শুনিয়াছিলাম, এক জন বিশেষ কৃতবিদ্য বাঙ্গালি যুবক অধ্যাপক ছাত্রগণকে 'ভাই' বলিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ করেন; এই মনোজ্ঞ ব্যবহারে তিনি ছাত্রগণের নিকট যে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা অপর অধ্যাপক

পান না। ইংরাজ অধ্যাপকের আচরণের দৃষ্টান্তে দেশীয় অধ্যাপকগণকেও যে ছাত্রগণের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হইতে হইবে, আমরা তাহা সঙ্গত মনে করি না। এখানেও গঠন-কার্য্যের যথেষ্ট অভাব আছে।

বেশ-বিন্যাসে অনেককে ইংরাজের অনুকরণ-প্রিয় দেখা যায়। ইহা চিন্তাহীনতার নাম মাত্র। আমাদের দেশকে, জাতিকে ও আচার-ব্যবহারকে যথাসম্ভব মানিয়া চলিতে হইবে। কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছা ও নিজের রুচির উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। বেশে ও খাদ্যে, আচারে ও ব্যবহারে ঐক্য না থাকিলে জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে ঐক্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। এই ঐক্যের অভাবই একভাবে আমাদের জাতীয় জাগরণের ও মিলনের অন্তরায়। বেশের, খাদ্যের ও আচারের পার্থক্য আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৈক্যের সৃষ্টি করে। আমরা পরস্পরকে অনুরাগের চক্ষে দেখিবার সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি হারাইয়া ফেলি। বেশের পার্থক্যে আমরা অনেক সময়ে আপনার বলিয়া অপরকে চিনিয়া লইতে পারি না—আমাদের অনুরাগ অগ্রসর হয় না। বিলাতপ্রত্যাগতের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের মধ্যে অনেকে ইহাঁদের অনুকরণে, বিলাতে না গিয়াও আহারে, বিহারে ও বেশে যথেষ্ট পরিমাণে ইংরাজের অনুকরণ করিতেছেন। 'বাবু' বলিলে ইহাঁরা বিরক্ত হন। 'বড় সাহেব' বা 'মেম সাহেব' না বলিলে ইহাঁদের সম্মানের হানি হয়। পূর্ব্বে উকীল ও ডাক্তার মহলে হ্যাট-কোটের চলন ছিল না। আজকাল ক্যাম্বেল স্কুলের শিক্ষার্থী হইতে আরম্ভ করিয়া নব্য উকীল মহলের অনেকে চোগা-চাপকান ছাড়িয়া হ্যাট-কোট ও নেক্‌টাই পরিধান আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য হ্যাট-কোটে অনেকটা কার্য্যের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে কতকটা সংযত বেশও চালান যাইতে পারে। নেক্‌টাই ও হ্যাট সহজে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। দেশী পাক্‌ড়ী বা টুপী ব্যবহার করা যাইতে পারে। তুমি যে এদেশী, তোমার বেশে তোমার আচরণে তাহার পরিচয় দেওয়া চাই। বেমালুম সাহেব সাজিয়া অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। অতুল্য বৈভবসম্পন্ন মহারাজা বর্দ্ধমান, চিন্তাশীল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কখনও হ্যাট ব্যবহার করিতেন না। রাজা রামমোহন ও মনস্বী দ্বারকানাথ দেশীয় পরিচ্ছদে বিলাতে গিয়াছিলেন। রাজপুত রাজাগণ আজকাল বিলাতে যাইতেছেন, যথেষ্ট সমাদরও পাইতেছেন, কিন্তু ইংরাজি সংবাদপত্রে তাঁহাদের পাক্‌ড়ীমণ্ডিত শিরোদেশ দেখিলে আনন্দ ও গর্ব্বের অনুভব হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে ও নিমন্ত্রণাদিতে অনেক বিলাতপ্রত্যাগতকে গত কয়েক বৎসর হইতে দেশীয় পরিছদে ভূষিত দেখিতেছি, ইহা বিশেষ সুলক্ষণ বলিতে হইবে।

আমরা যদি দেশকে সত্য সত্যই ভালবাসি, যথাসম্ভব দেশের আচরণকেও মান্য করিয়া চলিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী নিজে বিলাতপ্রত্যাগত। তিনি যদি হ্যাটকোট পরিয়া কার্য্যে অবতরণ করিতেন, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সহস্রাংশের এক অংশও পাইতেন না। চিত্তরঞ্জনের খদ্দর পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধ ফুটিয়া বাহির হইত। বিবেকানন্দ ত্যাগের ও বৈরাগ্যের আচ্ছাদনে ভূষিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাই আজ ভারতযোড়া তাঁহার প্রতিপত্তি। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যেরা তেমন ত্যাগের মূর্ত্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই; বিলাতীগন্ধ অল্পাধিক অনেকের ছিল, অনেকে দেশের শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া বাইবেলকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রচারে কতকটা বিলাতী আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই অনেকে আশ্চর্য্য প্রতিভা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাস্বর-মূর্ত্তি তেমন করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে ধরিতে পারেন নাই। আজকাল অবশ্য বিলাতী ভাবের অনেকটা অল্পতা ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও গঠনমূলক কার্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এখানে এ কথাটী বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আমরা দরিদ্র জাতি, উদরান্নের যথেষ্ট অভাব। যাঁহারা বিলাতী অনুকরণ করিতে চান, তাঁহাদের আদর্শে চিন্তাহীন অনেকে আবার তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া অভাব-অনটনের মধ্যে ও বিনাশের পথে আসিয়া পড়েন। High thinking and plain

living অর্থাৎ সমুচ্চ চিন্তা ও সাদাসিধা ভাবে অবস্থান করাই যে ভারতের চিরন্তন ধারা, এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। আপনার দেশের সেই আদর্শ বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইলে মহাপাতক আসিবে ইহা যেন স্মরণ থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিলাতপ্রত্যাগত পি, সি, রায় স্বদেশ ও স্বজাতিকে গভীর ভাবে ভাল বাসিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ তিনি খদ্দর-পরিহিত মূর্ত্তিতে আপনার দুর্ব্বল দেহে বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খদ্দর-প্রচারব্রত ও পল্লী-সংগঠন লইয়া অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম পত্তন হইবার কালে ইহার প্রকৃতি দেশীয় ছিল। বেদান্ত ও উপনিষদের উপর উহার প্রতিষ্ঠা ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহু সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে এমন একটি সময় আসিল যখন বাইবেলই অনেকের নিকট দেশীয় সংস্কৃত শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। মহর্ষি-রচিত উপনিষদ হইতে সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের উপর অনেকের অনুরাগ কমিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা চলিতে লাগিল। 'ব্রাহ্ম' নামে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। অনেকে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলেন। পরে পণ্ডিত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় যখন আসিলেন, সংস্কৃতের উপর অনেকের একটু অনুরাগ জন্মিল বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হয় নাই। উহার অনেক পরে শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ যখন উপনিষদ-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার আয়াসে প্রায় প্রতিদিন যখন শাস্ত্রচর্চ্চা ও আলোচনা চলিতে লাগিল, সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের অনেকের মতি একটু ফিরিয়াছে; অনেকে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দান করিবার গৌরব ধীরে ধীরে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিচালিত 'সাময়িক পত্রে' সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা—যাহা পূর্ব্বে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা বিপ্লবের ভিতর দিয়া গঠনের লক্ষণ বলিতে হইবে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ জ্ঞানী, প্রগাঢ় শাস্ত্রবিৎ হইলেও নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন না। পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা সে কার্য্য করাইতেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমধিক জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও বেদীর কার্য্য চালাইতেন তত্ত্ববাগীশ, বেদান্তবাগীশ, বেচারামবাবু ও বিদ্যারত্ন-প্রমুখ ব্রাহ্মণের দ্বারা। নিজে বেদীর আসন গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন; বলিতেন 'আমি বিষয়ী—এ কার্য্য আমার নহে।' পরে অনেকের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বেদীতে বসিতে আরম্ভ করেন, তাহাও প্রাগুক্ত পণ্ডিতগণের সঙ্গে। রাজার ও মহর্ষির উদ্দেশ্য ছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের ভিতরে চালাইতে হইবে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সাহায্যে ও তাঁহাদের মুখ দিয়া; তবেই হিন্দুসমাজ ইহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিবে। তাঁহাদের এই দূরদর্শিতা বুঝিবার লোক আজকালকার যুগে বড় অল্প। আমাদের কথা এই যে, ধর্ম্মসভায় আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবার অধিকার তোমার আমার মত ইংরাজি ভাষায় অর্দ্ধশিক্ষিত বা সংস্কৃত ভাষায় পল্লবগ্রাহী বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তির নহে। সংস্কৃত শাস্ত্র-ব্যবসায়ীকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া যদি গড়িয়া লওয়া যায় তবে ইহা তাঁহারই কার্য্য। ঊর্দ্ধ-সংখ্যায় আমরা জোর করিয়া lay preacher মাত্র হইতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে সত্যসত্যই কুণ্ঠা ও লজ্জা আইসে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মব্যাখ্যাতার যে যোগ্যতা নাই এ কথা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আজকাল স্বাদেশিকতার দিনে আহ্বান চারিদিক হইতে আসিতেছে। এদেশে ধর্ম্মের রাজ্যে সে আহ্বান কি আসে নাই? বেশবিন্যাসের আচারব্যবহারের দিকে সে আহ্বান কি শুনিতে পাইতেছ না? শিক্ষার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতা, যৌবন-বিবাহ, মনোনয়নপ্রথা অল্লাধিক পরিমাণে আসিবেই। এ অবস্থায় সঙ্করবিবাহ অবশ্যম্ভাবী। এই সঙ্কর-বিবাহ হিন্দুজাতির ভিতরে বহুযুগ ধরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সন্তানসন্ততিকে স্থান দিবার জন্যই হিন্দু সমাজে এত অসংখ্য জাতির পরিসমাবেশ। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও সঙ্করবিবাহ যথেষ্ট পরিমাণে

বিরাজমান। বিশাল হিন্দুসমাজের ভিতরে তাহাদের স্থান আছে, আর উদারভাবাপন্ন ব্রাহ্মগণ এই হিন্দুসমাজের ভিতরে স্বীয় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারিবেন না? আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে চলিবে না। ঐক্যের ও মিলনের ডাক আসিতেছে। পরস্পর যদি মিলিত হইতে পার অন্ততঃ ভাবে চিন্তায়, তবে মহৎ ফল অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা বিলাতপ্রত্যাগত,তাঁহারা হিন্দুসমাজের নিকট সুবিচার পান নাই। সে দোষ পরস্পরের। তাঁহারা হিন্দুসমাজ চান নাই। আচার-ব্যবহারে ও খাদ্যে তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিতে চাহিতেন। ক্রমে ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রায় সমস্ত জাতি তাঁহাদিগকে ক্রোড় পাতিয়া আশ্রয় দিতেছে। বিলাতপ্রত্যাগত পূর্ব্বপরিচিত হিন্দু-আচার আবার গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণের ভিতরেও ধীরগতিতে বিলাতফেরত ব্রাহ্মণগণ প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছেন, ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। ভারতীয় বলিয়া আত্মসম্মানবোধ জাগিয়া উঠিতেছে। সরকার হইতে উপাধিলাভের বিতৃষ্ণা প্রকৃত শিক্ষিতগণের মধ্যে বাড়িতেছে। হায়! একটি দিনের কথা আছে মনে পড়ে, জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরীর কন্যার বিবাহে অনেকে আসিয়াছিলেন। জষ্টিশ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কেও তথায় দেখি। উহার অল্পদিন পূর্ব্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় "সার" এই উপাধি পাইয়াছিলেন। ঐ বিবাহে আর একজন পদস্থ ব্যক্তি আশু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় যে আপনি "সার" হইয়াছেন। আশুতোষ তাহার উত্তরে বলিলেন, 'আমি উহাতে বিশেষ আনন্দিত হই নাই। "সার আশুতোষ" না বলিয়া যদি কেহ আমাকে "মুখুয্যে মহাশয়" বলে তাহাতেই আমি অধিকতর সন্তুষ্ট।' আশুবাবুর এই উত্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার বিরাট হৃদয়ের অন্তস্তল বুঝিবার অবসর হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত গঠনের পক্ষে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ভাঙ্গনের বিরোধী নহি। বাহির হইতে আলোক আসিতেছে, কতকটা বা সত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া, কতকটা অসত্যের মোহিনীরূপে। প্রাচীনের সহিত উহার ঘাতপ্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভাঙ্গনের ভিতর দিয়া প্রকৃত সত্য ধীরে ধীরে তাহার নিজের প্রকৃত স্বরূপ জাগাইয়া তুলিবেই। নূতনত্বের একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, অনুকরণের একটি মোহ আছে। এই আকর্ষণ এই মোহকে অতিক্রম করিয়া স্বদেশের যে একটি স্নিগ্ধ ভাব আছে, তাহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, ভারতের বিশেষত্বকে ভুলিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের উত্থান-পতনময় যে ইতিহাস আছে ভবিষ্যতে উহার একটি নবপর্য্যায় আরম্ভ হইতে বাধ্য। কিন্তু উত্থানই উহার প্রকৃত মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়ায়, এবং পতনের সমস্ত সম্ভাবনা যেন দূরে অপসারিত হয়। ভাঙ্গনের অন্তে সুগঠন যেন চারিদিকে জাতীয়ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে ইহাই আমাদের কামনা।

ডাক।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

ধরণীর ঘাসেরা এই
ডাকে আমায় ডাকে।
ধরণীর গন্ধ-বরণ
ডাকে আমায় ডাকে।

সমুখের এই নীলাকাশ
সুরভি এই সুবাতাস
সুমধুর এই ফুলহাস
ডাকে আমায় ডাকে।

ধরণীর কান্নাহাসি
ধরণীর স্নেহ-প্রীতির রাশি
ডাকে আমায় ডাকে।

রুদ্ধ ঘরের আঁধার কোণে
থাকিস্ নে আর বিষাদ মনে
বাহির হ'রে আনন্দে তুই
সাড়া দে
সুন্দরের ঐ ডাকে॥

যুগাবতারদ্বয়।

রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অতি ক্ষুদ্র পরমাণু অবধি শ্রেষ্ঠতম মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অসীম শক্তির এক-একটী কণিকা—সুতরাং তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অবতার। যখন কোন কিছুতে ভগবানের শক্তির কার্য্য কিছু বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখনই আমরা তাহার ভিতর ভগবানের মহিমা কিছু বিশেষভাবে উপলব্ধি করি এবং তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া যাই। প্রতিদিনই আমরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং বায়ু অবলম্বনে জীবন ধারণ করি, কিন্তু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ভগবান তাঁহার মঙ্গল বিধানে উহা এতই সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন যে, উহার ভিতর ভগবানের লীলা ও মঙ্গলহস্ত সহজে উপলব্ধি করি না। কিন্তু যে বায়ুর সাহায্যে আমরা বাঁচিয়া আছি, সেই বায়ুই যেদিন প্রচণ্ড প্রভঞ্জন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতি ভূমিসাৎ করে, সেই দিন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ভিতর ঈশ্বরের মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি।

তুমি মানব, আমি মানব; আমাদের সকলেরই সাধারণ সুখদুঃখ আছে, ভয়-মোহ আছে। যতদিন আমরা সেই সাধারণ সুখদুঃখের ভিতরে খেলা করিতে থাকিব, ততদিন প্রকৃত মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করিলাম না। "মানবের এই একটা মহান অধিকার যে, মানুষ অপরের জন্য চিন্তা করিতে পারে, অপরের দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করিতে পারে, জগতের বিরাট স্বার্থের ভিতর নিজের স্বার্থকে ডুবাইয়া দিতে পারে।" যতদিন আমরা সেই সহজাত অধিকারের সদ্ব্যবহারে অগ্রসর না হই, প্রকৃত মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা না করি, ততদিন মানবাত্মায় ভগবান যে অসীম বল অন্তর্নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সে বল নিজে উপলব্ধি করিতেই পারি না, প্রকাশ করা তো দূরে থাক। সুতরাং আমার অন্তরে ভগবান যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমিও যে তাঁহার শক্তি লইয়া তাঁহারই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা যতটুকু অপরের দুঃখে প্রকৃত সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিব, অপরকে প্রাণ ভরিয়া যতটুকু ভালবাসিতে পারিব, এক কথায় ভগবৎপ্রদত্ত বিশেষ অধিকারের যতটুকু সদ্ব্যবহার করিতে পারিব, ঈশ্বর সেই পরিমাণেই আমাদের আত্মশক্তিকে বর্দ্ধিত করিবেন; তখন আমাদের শরীরের প্রতি পরমাণু, হৃদয়ের প্রতি ভাব ঈশ্বরের মঙ্গলালোকে মহীয়ান হইবে, দিকসকল প্রসন্ন হইবে, দ্বন্দ্ববিমূঢ় জনসাধারণ ঐশ্বরিক তেজের সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে; সেই পরিমাণে আমাদের অবতারত্বও সাধারণের নিকট পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে।

প্রকৃতির ভিতরে একটী নিয়ম দেখা যায় যে, দুইটী শক্তির পরস্পর সংঘর্ষের ভিতর দিয়া, ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়াই তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বহির্বিকাশ লাভ করে এবং সাধারণের প্রত্যক্ষ হয়। উল্কাপিণ্ড যতক্ষণ সংঘর্ষের অবসর না পায়, ততক্ষণ তাহার গতি ও অন্তর্নিহিত তেজ বাহিরে প্রকাশ পায় না; কিন্তু বায়ুর সহিত সংঘর্ষণ লাভ করিলেই সেই তেজ বাহিরে প্রকাশ পাইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নদীস্রোত অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইবার অবকাশ পাইলে বিনা গোলযোগে সাগরের অভিমুখে ধাবিত হয়, কিন্তু সেই প্রবাহপথে তাহার গতি অবরুদ্ধ হইলে তাহা অতিক্রম করিবার সময় উহার যে তেজ প্রকাশ পায়, তাহার সম্মুখে নগরপল্লী কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। সেইরূপ মানবেরও আত্মশক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হইবার অবসর পাইলে নিজের পরিচয় প্রদানে বড় একটা ব্যস্ত হয় না; কিন্তু বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইলে সেই অবরোধ অতিক্রম করিতে গিয়া এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন মানুষ যে ভগবানের শক্তির অবতার, তাহা সকলের প্রত্যক্ষ হয়। তাই এইরূপ সংঘর্ষের যুগ উপস্থিত হইলেই অবতারের সংখ্যাও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণ্ডিতেরাও তাই এইরূপ সংঘর্ষের যুগকে, ঘাতপ্রতিঘাতের যুগকে যুগোৎপত্তির কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই যুগোৎপত্তির সময়ে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত পন্থার গতিকে নূতন যুগের উপযুক্ত মুখে পরিচালিত করেন। উভয় যুগের সংযোজনী গতিই নবযুগের মুখ্যভাব বলিয়া পরিগণিত হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত অনেক যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং "অসংখ্যেয়" অবতারেরও সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক এক অবতার এক এক যুগে এক-একটী নূতন ভাবের জন্মদান করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপে বিশ্বজগতকে উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত করিয়া দিয়াছেন। এক শক্তির সহিত শক্ত্যন্তরের সংঘর্ষণেই পরশুরাম, রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি বিভিন্ন অবতারসূচিত বিভিন্ন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। পুরাণকথা ছাড়িয়া দিলেও, বর্ত্তমান যুগের অন্যতর প্রধান ঘটনা ফরাসিবিপ্লবের অপূর্ব্ব কাহিনী আলোচনা করিলেই এই সত্যের নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধ হইবে।

ফরাসিবিপ্লবসূচিত যুগের প্রধানতম অবতার হইলেন নেপোলিয়ান। ফরাসিবিপ্লবের পূর্ব্বে জগতে যে যুগ

চলিতেছিল, তাহার মূল মন্ত্র ছিল রাজতন্ত্র—সে যুগে রাজাই দেবতা—রাজাই ঈশ্বর। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় রাজারা প্রকৃতই উপলক্ষমাত্র হইয়া ঈশ্বরের পালনী শক্তি প্রজাগণের উপর সমভাবে বিস্তার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন; প্রজাদের স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণের ক্ষমতা ক্রমশঃই অধিকতর অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই বাধা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। বাঁধের একদিকে সৌধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া রাজারা নিশ্চিন্তমনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, অপর দিক হইতে রুদ্ধ প্রজাশক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে বাঁধের মাথায় মাথায় উঠিয়া যে তাঁহাদের সৌধ প্রভৃতিরও ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরই হয় নাই; এরূপ ঘটনা যে সম্ভবপর, তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারেন নাই। ফরাসিরাজ ষোড়শ লুই অবশেষে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া প্রজাশক্তিকে ধীরে ধীরে অন্যমুখে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই উদ্দাম রুদ্ধ তেজ তাহা মানিবে কেন?

সেই উদ্দাম রুদ্ধ তেজ তখন সেই সাধারণপন্থার পথ অবলম্বন করিয়াই অল্প কালের মধ্যেই বাঁধ, সৌধ সমস্তই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সেই তেজের মুখে প্রধানতম আহুতি প্রদত্ত হইলেন ষোড়শ লুই এবং তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গ। ফরাসিবিপ্লবের কালে যে নেতা রুদ্ধ তেজের শক্তি যতটুকু অন্তরে ধারণ করিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনিই ততটুকু অবতারের পূজা লাভ করিয়াছিলেন। এই যুগের অবতার হইলেন রুসো, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি। বীর নেপোলিয়নে এই যুগের সমুদয় তেজ ও ভাব যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাই তিনিই ইহার প্রধানতম অবতার। ইউরোপের রাজগণ মিলিতভাবে চেষ্টা করিলেও সেই তেজকে প্রতিরুদ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। ফরাসিবিপ্লবের মূলমন্ত্রই হইল প্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থা। ফরাসিবিপ্লবের পর পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এই মন্ত্র অল্পবিস্তর স্বীকৃত হইয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভারতবর্ষেও তাহার তরঙ্গ আজ বহুদিন যাবত আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সেই মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ সুদীর্ঘ নিদ্রা ও আলস্যের পর আজ সহসা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

অবতারের অন্যতর প্রধান লক্ষণ হইল সংগঠন। রুদ্ধ শক্তিকে বাহিরে প্রকাশ করাই কেবল অবতারের উপযুক্ত কার্য্য নহে, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিয়া তাহাকে গঠনোন্মুখী গতি দেওয়াই হইল তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কেবল ভাঙ্গা-চোরা অনিষ্ট আনা অবতারের কর্ম্ম নহে, প্রত্যুত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবীজ রোপণ করাই হইল যুগাবতারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। রোব্‌স্পীয়র, ম্যারট, ড্যান্টন প্রভৃতি ফরাসি বিপ্লবে অবতারের উপযুক্ত কর্ম্ম করিবার যথেষ্ট অবসর পাইলেও যে ভাবে কেবল হত্যাসাধনের পথে চলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা জল্লাদ অসুর প্রভৃতির খ্যাতি লাভ করিতে পারেন এবং করিয়াছেনও,* কিন্তু অবতার রূপে স্বীকৃত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ভীষণ হত্যাযজ্ঞই বীর নেপোলিয়নরূপ অবতারের অবতীর্ণ হইবার পথ খুলিয়া দিয়াছিল সত্য। নেপোলিয়ান কেবল যুদ্ধ করেন নাই; বলিতে গেলে, তিনি ইউরোপীয় সমাজের একটা নূতন আকার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল যুদ্ধে নামিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হৌন বা না হৌন, মঙ্গল উদ্দেশ্যেই সেই সমস্ত যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মোটের উপর ধরিতে গেলে, সমগ্র পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের যুগ চলিয়াছে। বিগত মহাসমরের পর সেই যুগের মূল মন্ত্র প্রজাতন্ত্রের কর্ম্মক্ষেত্র বহুল প্রসার ও প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে। আবার ফরাসিবিপ্লবেরই ফলে যে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তিযুগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রধানতম অবতার ছিলেন স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

আমাদের ভারতবর্ষে পৌরাণিক কাল ব্যতীত আধুনিক কালেও অনেক যুগের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। বুদ্ধদেব তাঁহার কর্ম্মমন্ত্র প্রচারের ফলে যে যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত সে যুগের ছায়া অন্তর্হিত হয় নাই, বরঞ্চ জগতে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মমন্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। চৈতন্যদেবের ভক্তিমন্ত্র এক নবযুগের সৃষ্টি করিল। গ্রীক সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারতজয়ে আসিলেন, তখন ভারতে একটা নবতর যুগের সূচনা হইল। পাঠানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিলে একটা যুগ আসিল—সে যুগের অবতার হইলেন সের সা। আবার মোগলগণ যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন আর একটা যুগান্তর ঘটিল; এই যুগের প্রধানতম অবতার হইলেন মহাত্মা আকবর। বিদেশীদের সহিত সংঘর্ষণে হিন্দুদেরও মধ্যে রাজা পুরু, রাণা প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবতারও সমুত্থিত হইয়াছিলেন।

অবশেষে ইংরাজগণ পলাশিক্ষেত্রে যে দিন জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন, সে দিন ভারতে আর একটা নবযুগের আরম্ভ হইল। এই যুগের মধ্যে আমরা আজও বাস করিতেছি। যে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র লইয়া এই যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে কলিকাতাই তাহার কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িল। ভারতের পক্ষে এই যুগের প্রধানতম

অবতার দাঁড়াইলেন দুই জন—রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইঁহারাই ভারতের রুদ্ধ ভাব ও শক্তিকে ঠিক ধরিয়া বাহির করিলেন এবং কালের ইঙ্গিত বুঝিয়া ঐ ভাব ও শক্তি মঙ্গলের পথে, গঠনের পথে পরিচালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় অবতারের পদে দাঁড়াইলেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর দাঁড়াইলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতভূমিকে যুগ-ধর্ম্মের পথে অল্প সময়ে অনেক দূর অগ্রসর করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্র ছিল জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতা সংস্থাপন। রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিবার ফলেই দেশবাসীর সকল জ্ঞান লাভের অধিকার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, এবং ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রচারের ফলে দ্বারকানাথের ভারত অবধি ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দুইজনেরই জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কার্য্য অনেকটা অনুরূপ; কেবল দুইজন দুই বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে দেশের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন—একজন ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারকে কর্ম্মক্ষেত্র ধরিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেশের উদ্গার সংস্থাপনের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই অবতার যে শাণ্ডিল্যগোত্রে ও ভট্টনারায়ণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে গোত্র এবং সে কুল ধন্য; ইঁহারা যে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশ ধন্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অশ্রুমতী। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী'র ন্যায় আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। গ্রন্থখানি ইংলণ্ড-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসৃষ্ট হয়। উৎসর্গ-পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভাই রবি,

তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখ্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাসদুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে, তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ
১৮০১ শক
তোমার

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন—

ভাই জ্যোতি দাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন
রবি।

নাটকখানির আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই :—

সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ একদা চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ তাঁহার ভগিনীকে মোগলের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপসিংহ তাঁহার সহিত একত্র ভোজনে সম্মত হন নাই। ইহাতে মানসিংহ অপমান বোধ করিয়া আকবরকে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং স্বয়ং যুবরাজ সেলিমের সহিত যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রতাপ পরিবারসমভিব্যাহারে পর্ব্বত-কন্দর হইতে পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় লন। একদা তাঁহার অনুপস্থিতিতে মানসিংহ প্রতাপের কন্যা 'অশ্রুমতীকে', ফরিদ নামক জনৈক মুসলমান দ্বারা অপহরণ করিয়া লইয়া যান এবং উভয়ের বিবাহ দিয়া প্রতাপের কুলগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ অশ্রুমতী সেলিমের নয়ন-পথে পতিত হওয়ায় তাঁহার সে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। সেলিম অশ্রুমতীকে তাঁহার পদোচিত সম্মানের সহিত রাখেন। সেলিমের প্রতি অশ্রুমতীর কৃতজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সেলিমও অশ্রুমতীর অনুরাগী হইয়া পড়েন। প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া মোগল শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভ্রাতার কুল-গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বিবাহে বাধা প্রদান করেন এবং অশ্রুমতীকে প্রতাপের নিকট লইয়া যান। প্রতাপ তখন মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। তিনি অশ্রুমতীকে কলঙ্কিনীজ্ঞানে বিষপানের আদেশ দেন। পরে শক্তসিংহ অশ্রুমতীর নির্দ্দোষিতা ও শুচিতা সপ্রমাণ করিলে মহারাণা তাঁহাকে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া চিরকুমারী থাকিয়া মহাদেবের ধ্যান করিতে আদেশ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অশ্রুমতীও আজীবন কুমারী থাকিয়া পিতার আদেশ পালন করেন।

এই নাটকখানি বহুবার 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত

হইয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। এই নাটকের অন্তর্গত কতকগুলি গীত এখনও বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং এই গীতগুলি ব্যতীত কোনও বাঙ্গালা সংগীত-সংগ্রহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে পারা যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম', 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'—সকল নাটকই হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং ভারতের নানাস্থানে অভিনীত হইয়াছিল। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনায় অভিনয় কালে, গ্রন্থকার প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের কন্যাকে সেলিমের অনুরাগিনী করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ এবং নাট্যকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এমন কি, কেহ কেহ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া উঠেন। কলিকাতা-প্রবাসী অনেক রাজপুত ক্ষত্রিয়ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। অনেকেই গ্রন্থকারকে এ সম্বন্ধে নানা পত্র লিখিয়া অনুযোগ করেন। আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাগজ-পত্রের মধ্যে (তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে) প্রাপ্ত কতকগুলি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

Barabazar Library
203 Harrison Road.

Calcutta, the 25th. September, 1901.

From Pandit Kesab Prasad Misra
Honorary Secretary to the Barabazar
Library

To

Babu Jotirindra nath Tagore
Jorasanko

Dear sir,

Myself and several prominent members of the Library have carefully gone through your book entitled 'Asrumati' and find therein, to our great astonishment, that Maharana pratap Singh, the greatest of the Hindu sovereigns, had a daughter in the person of Asrumati, who deeply fell in love with a Mahomedan prince. Would you please let us know the source from which you have got your information in connection with it.

Yours truly
(Sd) Kesab Prasad Misra
Hony. Secretary to the Barabazar Library

(২)

Barabazar Library
203 Harrison Road,
Calcutta, 30th September, 1901.

From

Pandit Kesab Prasad Misra
Hony. Secretary to the
Barabazar Library

To

Babu Jyotirindra Nath Tagore
Calcutta

Dear Sir,

Whilst much admiring the style, diction and poetry of your drama 'Ashrumati' I am constrained to say that it is not proper to associate prominent historical characters with matters quite foreign to them. Everything has its limits, and even dramatic & poetical imagination with its great latitude is no exception to it. Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter Ashrumati's love for the Mahomedan prince Salim, based upon pure imagination is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by the Hindu society. In the eyes of many persons reading the drama, the noble and lofty ideas and notions, rightly entertained and cherished by them, towards that great Rajput are apt to be sullied ; and in the interest of history and justice, it is highly desirable that nothing should be done to lower him in the estimation of the Hindu public. I trust that you will please see your way to stop either further publication of the book or to substitute some fictitious character in the place of the much esteemed name of Maharana Pratap Singh.

Yours truly
Kesab Prasad Misra
Hony. Secy. to the Barabazar Library.

"ভারতমিত্র" পত্রের সম্পাদকও তৎসম্পাদিত পত্রে প্রকাশিত 'অশ্রুমতী'র একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রেরণ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উক্ত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

(৩)

১ অক্টোবর ১৯০১।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত "ভারতমিত্র" পত্রিকায় "অশ্রুমতী'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা আমি পাঠ করিলাম এবং তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা নিম্নে লিখিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদ কিম্বা মর্ম্মার্থ "ভারতমিত্রে" প্রকাশ করিলে পরম বাধিত হইব।

মহারাণা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি, "অশ্রুমতী" বলিয়া প্রতাপ সিংহের কোন কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা মাত্র। আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতাপ সিংহের চরিত্র-গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন প্রতাপ সিংহ আসন্ন মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া শক্তসিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাপ-হস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রুমতীর মনেও পাছে কোন কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে—এই আশঙ্কায় তিনি তাকে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

আর এক কথা। যদি বলেন, রাজপুত-মহিলা হইয়া অশ্রুমতী কি করিয়া একজন বিধর্ম্মী মুসলমানকে ভালবাসিল, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই ;—অশ্রুমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলদের নিকটে থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্ম্মজ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল ; সে জানিত না—কে রাজপুত, কে মুসলমান। সেলিম তাহাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এবং কি অবস্থায় পড়িয়া অশ্রুমতী রাজপুত মহিলার অযোগ্য কাজ করিয়াছিল, তাহা যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্রুমতীকেও দোষ দেওয়া যায় না। আর এক কথা, অশ্রুমতী সেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল—শুধু ইহাতেই প্রতাপ সিংহের কুলে কলঙ্ক আসিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাসাতেও যদি কিছু কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপ সিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আন্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে বলিতে সাহস হয় না, আর একবার যেন তিনি এই নাটকখানি ধীরভাবে পড়েন—আমার বিশ্বাস, আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে, তিনি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এই নাটকে ঐতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পারে ; কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপসিংহের উপর আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

ভবদীয়

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠকগণ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন বলিয়া আর একখানি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভূমিকায় বিশদ ভাবে সকল কথা বুঝাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করেন। উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর 'ভারতমিত্র' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

(৪)

The "Bharat Mitra" Office
Established 1878
Telephone No. 137

97 Muktaram Babu's street
Calcutta, the 8th Oct. 1901

To

Babu Jyotirindra Nath Tagore
19 Store Road Ballygunge, Calcutta

Sir

I cannot sufficiently thank you for your desire to amend the wrongs, your work the "Asrumati" has caused to the Hindus of Rajputana and Upper India. To err is no doubt human, but to admit it when shewn and correct it when fully convinced are rare qualifications of great men only. By this noble sacrifice you have proved yourself worthy—of this latter clan. With these few words of thanks for your laudable wish,

which will no doubt be brought into action in the near future.

I remain
Yours ever faithfully
Balmukund Gupta
Editor "Bharata Mitra"

পণ্ডিত কেশবলাল মিশ্রের পত্রের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

(৫)

"মান্যবরেষু

আপনার ১৭ অক্টোবরের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পত্রের উত্তর বাঙ্গালায় লিখিতেছি ; কেন না, ইংরাজি ভাষায় আমার তেমন অধিকার নাই। তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, সেলিমের সহিত অশ্রুমতীর ভালবাসা হওয়ায় প্রতাপ সিংহের শুভ্র যশে কলঙ্ক পড়িয়াছে। কিন্তু আপনারা যদি প্রণিধান করিয়া নাটকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, আমি এই ভালবাসার বিশুদ্ধতা বরাবর রক্ষা করিয়াছি—শারীরিক স্পর্শে ইহাকে দূষিত হইতে দেই নাই।

চতুর্থ অঙ্ক ১৭৮ পৃষ্ঠা—

"সেলিম।—দেখ যেন প্রতাপ সিংহ তার দুহিতাকে কলঙ্কিত না করেন—আমি শপথ করে বলচি ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের কখন স্পর্শ পর্য্যন্ত হয়নি।"

বিবাহ হওয়া দূরে থাক্ শারীরিক স্পর্শও হয় নাই। এ অবস্থায় প্রতাপ সিংহের কুলমর্য্যাদার কি কোন হানি হইতে পারে ?—বিন্দুমাত্র নহে।

পঞ্চম অঙ্কের ১৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—উহাতে সমস্ত প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রতাপসিংহ অশ্রুমতীকে বিষ খাওয়াইতে উদ্যত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহ প্রবেশ করিয়া প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিলেন—

"প্রতাপ।—কি বল্লে শক্ত সিংহ ?—আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি ?

শক্ত সিংহ।—না, মহারাজ হয়নি। সেলিম যে রকম যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, তাতে কোন্ সরলা বালার মন আর্দ্র না হয় ? কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি—আর তরবারি স্পর্শ করে শপথ করতে পারি, সেলিম কর্ত্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি—শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার সে কথা স্বীকার করতে হবে—এ আপনাকে আমি শপথ করে বলচি—কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।

প্রতাপ।—আঃ! আঃ! শক্তসিংহ! ভাই! তোমার কথায় তবু একটু আশ্বস্ত হলেম। অশ্রুমতি! এইদিকে এস। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্বিগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর একটী কথা বলবার আছে—অশ্রুমতি, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তাহলে আমি এখন সুখে মরতে পারি।

অশ্রু। বল বাবা—আমি তা রক্ষা করব।

প্রতাপ। পুরোহিত!

পুরোহিত। মহারাজ!

প্রতাপ। অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত কর—চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে তাও অপনীত হবে—যাও নিয়ে যাও।"

তবে যাঁহারা মনে করেন, এই ভালবাসার কথা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনর্মুদ্রণের সময় এই বিষয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিষ নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হয় না।

বাল্যবিবাহ।

(শ্রীসুষমা দেবী)

মনুষ্যজীবনে বিবাহ-ব্যাপারটী এক অতি গুরুতর বিষয়। যে যুবা বিবাহ করিতেছে, সে ভবিষ্যতে স্ত্রী-পুত্র পালন করিতে পারিবে কি না, তাহার হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা হইলে উহারা কিরূপ অবস্থায় থাকিবে এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করা উচিত। ভারতবাসী হিন্দুদিগের ইহা আরও ভাবনার বিষয়, কারণ আমাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ নাই। পতি যেমনই হউক না কেন, আজীবন স্ত্রীর তাহাকেই মানিয়া চলিতে হইবে। বিবাহরাত্রেই বালক-পতির মৃত্যু হইলে বালিকা-পত্নীকে চির বৈধব্যে কাল কাটাইতে হইবে।

ছাত্রাবস্থায় বহু বালকের বিবাহ হইয়া যায় এবং অনতিকাল মধ্যে তাহাদের দু-একটি সন্তানেরও জন্ম হয়। আবার এই সময়ে অনেকেরই উপর সংসারের ভারও পড়ে। তখন তাহারা সংসারচিন্তায় এরূপ জড়িত হইয়া পড়ে যে, জীবনে উহাদের দ্বারা যে সব উচ্চ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারিত তাহা আর ঘটিয়া উঠে না।

বালক পিতার ঔরসে এবং বালিকা মাতার গর্ভে

জন্মিয়া শিশুগুলি স্বভাবতঃ ক্ষীণজীবী হয় এবং এই জন্য প্রায়ই বালিকাবয়সের মাতার প্রথম সন্তান বাঁচে না। যাহাদের নিজেদের দেহই পূর্ণতা লাভ করে নাই এরূপ পিতামাতার সন্তান যে অল্পায়ু হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

এই বাল্যবিবাহের কারণে আমাদের দেশে স্ত্রীলোক 'কুড়িতে বুড়ী' হয় এবং সমস্ত জাতিটার 'চল্লিশে চাল্‌শে' ধরে। 'বেনারস থিওসফিকাল্ গার্লস্ কলেজের' ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিস্ ব্রাউনের প্রায় ৫৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল, যখন তিনি ঐ কলেজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সেই সময় দুই-চারিটি বালিকা তাঁহাকে "বুড়ি মেম" বলিত। একদিন তিনি ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"ঐখানেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। আমরা সত্তর বৎসরের পূর্ব্বে নিজেকে অক্ষম ও বৃদ্ধ বলে মনে করি না। আমার বয়সের লোকদের আমাদের দেশে প্রৌঢ়া বলে—বৃদ্ধা নয়"। ইহার কিছুদিন পরে আর একটি বড় কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিউজিল্যাণ্ড গমন করিতে হয়। তখন যুদ্ধের সময়। শত্রুর গুপ্ত 'ডুবি জাহাজ' অনেক যাত্রী জাহাজকে ডুবাইয়া দিতেছিল; এই কারণে, সকল জাহাজেরই প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীকে বিপদসূচক সাঙ্কেতিক ডাকের ঘণ্টা পড়িলেই, ঐ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া 'জীবনপান্সিতে' নামিবার জন্য যাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারে, সেই জন্য প্রত্যহ রীতিমত শিক্ষা (Drill) দেওয়া হইত। নিউজিল্যাণ্ড গমনকালে মিস্ ব্রাউনও এই ড্রিল শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পান নাই। আর আমাদের ঐ বয়সে নিউজিল্যাণ্ডের মত সুদূর প্রদেশের কথা দূরে থাকুক লক্ষ্ণৌ-দিল্লী যাইতেও দুই-চারিবার ভাবিতে হয়।

বাল্যবিবাহের জন্য এদেশে পিতামাতা বা অভিভাবকগণই দোষী। কন্যা নয়-দশ বৎসরের হইতে না হইতে, মাতার পেটে ভাত হজম হয় না উহার বিবাহের ভাবনায়, পুত্রেরও কুড়ি-বাইশ বৎসর হইতেই উহার ঘাড়ে বোঝা চাপাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

বিবাহের বয়স স্থির করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ছাত্রদের ছাত্রজীবন শেষ হইবার পূর্ব্বে উহাদের বিবাহ দিয়া যে দেশে অনর্থ উৎপাদন হইতেছে, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। আমাদের দেশে পিতামাতার যে-কোনও-প্রকারে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়াই যে চরম কর্ত্তব্য। ঋণগ্রস্ত হইয়াও এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহারা যেন একটা মহাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বলিয়া মনে করেন। দেশের কতিপয় ধনী ব্যক্তিদের ছাড়িয়া দিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের লইয়াই আমরা আলোচনা করিব। উহাঁরা দেশের মস্তিষ্কস্বরূপ। শারীরিক ও মানসিক বহু পরিশ্রম দ্বারা যাহাদের জীবিকার সংস্থান হয়, তাহাদের পক্ষে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসার-ভারগ্রস্ত হওয়া উচিত কি না তাহা সকলের বিবেচনার বিষয়। শাস্ত্রে পচিশ হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের প্রশস্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আর কন্যার দ্বাদশ হইতে ষোড়শ। কিন্তু আজ-কাল এরূপ রোগ ও ব্যাধির প্রভাব কালে কন্যার আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া আঠার বৎসর করিলেও ভাল হয়।

পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর সেরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। কেহ কাহারও প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা বা অন্যের কষ্টে সাহায্য করে না। এই নিমিত্ত প্রত্যেকের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিবাহ করা উচিত নহে। পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরুষের বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ এবং চরিত্রও গঠিত হয় না। যাহাকে বিশেষ কোনও কর্ম্ম লইয়া জীবিকা সংস্থান করিতে হইবে তাহারও অল্প বয়সে বিবাহ করা, উচিত নহে। এই সময় তাহার মস্তিষ্কের যথেষ্ট পরিচালনা হওয়াতে স্বাস্থ্যের উপরও আঘাত পড়ে; তাহার উপর বিবাহ করিয়া শরীরকে নিস্তেজ করা একটী মহাপাপ বলিলেই হয়। হিন্দুশাস্ত্রে ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার বারংবার উপদেশ আছে। ঐ আদেশের বিশেষ প্রয়োজন চারি যুগের মধ্যে যদি কোনও যুগে হইয়া থাকে ত তাহা এই আজি-কালিকার যুগে।

এই বাল্য বিবাহ আমাদের দেশে যথেষ্ট অবনতি আনয়ন করিয়াছে এবং করিতেছে। যে বয়সে ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্ত্রী ও পুরুষেরা বিবাহের কথা একেবারে মনে স্থানই দেয় না, সেই বয়সে আমাদের বালক-বালিকারা সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া যায়; ইহাতে সমাজের ও দেশে যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া কি উচিত নয় ?

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ভৈরবী—তেওরা।

তোমায় ছেড়ে আর যাব না
ঐ'ব চরণে।
তোমার চরণ শরণ ক'রে
শান্তি মরণে।

তোমায় ভুলে হে ভুবনেশ,
অন্তরে মোর নাই সুখ-লেশ
ব্যথার পরে ব্যথা এসে
বাজে মরমে॥

এবার আমার হৃদয়-মাঝে
অরূপ ও রূপ দেখ্‌বো রাজে
নীরব বাণী শুনবো কানে
অভয় হব সকাল-সাঁঝে।

দুঃখ বা সুখ যা' আসে তায়
বরণ করে নেব মাথায়—
জানবো রুদ্রের আশীষ ঢাকা
এ আবরণে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা -রা | জ্ঞা -মা I জ্ঞা -া ঋা | সা -া | দ্‌া -ণ্‌া I
তো মা য় ছে ॰ ড়ে ॰ আ র্ যা ব ॰ না ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -ঋা | মা -জ্ঞা | ঋা -জ্ঞা I সা -া -া | -া -া | -া -া } I
র ব ॰ চ ॰ র ॰ ণে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ণ্‌া সা -দা | দা -া | দা -া I পা পা -া | দপা -মজ্ঞা | রা -া I
তো মা র্ চ ॰ র ণ শ র ণ ক॰ ॰॰ রে ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা -পা মা | পমা -ণা | দা -পা I মা -া -া | -া -া | -া -া II
শা ন্ তি ম ॰ র ॰ ণে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { মা দা -া | ণা -দা | দা -ণা I ণা -র্সা ণা | র্সা -া | র্সা -া I
তো মা য় ভু ॰ লে ॰ হে ॰ ভু ব ॰ নে শ্‌

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা -র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞাঃ -র্রঃ | র্জ্ঞা -র্মা I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্ঋা | র্জর্ঋা -া | র্সা -া } I
অ ন্ ত রে ॰ মো র্ না ই সু॰ খ ॰ লে শ্‌

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -পা | পা -া | পা -দা I দণা দণা -া | দা -া | পা -া I
ব্য থা র্ প ॰ রে ॰ ব্য থা ॰ এ ॰ সে ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা -মা | পমা -ণা | দা -পা I মা -া -া | -া -া | -া -া II
বা জে ॰ ম ॰ র ॰ মে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

```
   ১´             ২          ৩              ৩                ১´        ২
II { ণ্‌া সা -া ।  সা -া ।  সা -ঋা I   জ্ঞা জ্ঞা -মা ।  মা -া ।  মা -া I
     এ  বা  র্‌     আ  ◦     মা  র্‌      হৃ   দ   য়      মা  ◦    ঝে  ◦

   ১´              ২            ৩          ১´                 ২            ৩
I পা মপা -জ্ঞা ।  জ্ঞাঃ -রঃ ।  জ্ঞা -া I  সঋা -জ্ঞমা জ্ঞা ।  জ্ঞঋা -া ।  সা -া}I
  অ  রূ   প্‌      ও   ◦       রূ  প্‌     দে◦  ◦থ্‌  বো       রা  ◦      জে  ◦

   ১´           ২         ৩           ১´              ২          ৩
I সা সা পা ।  পা -া ।  পা -দা I   পদা ণা দণা ।  ণদা -া ।  পা -া I
  নী  র  ব     বা  ◦    ণী  ◦      শু◦  ন্‌ বো     কা  ◦     নে  ◦

   ১´           ২          ৩          ১´               ২          ৩
I সা সা -া  । সা -ঋা ।  মা -া I  মজ্ঞা জ্ঞা -া ।  জ্ঞঋা -া ।  গা -া II
  অ  ভ  য়     হ  ◦      ব  ◦      স   কা  ল্‌     সাঁ  ◦     ঝে  ◦

    ১´            ২          ৩          ১´              ২          ৩
II { পা -া মা ।  ণদা -া ।  দা ণা I   র্সা -র্ঋা ণা ।  র্সা -া ।  র্সা -া I
     দুঃ ◦  থ     বা◦  ◦    সু  থ     যা’  ◦   আ     সে  ◦     তা  য়্‌

   ১´              ২            ৩            ১´                  ২            ৩
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা ।  র্জ্ঞা -র্রা ।  র্জ্ঞা -র্মা I  র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋা ।  র্জ্ঞর্ঋা -া ।  র্সা -া } I
  ব   র   ণ       ক   ◦        রে   ◦        নে   ব   ◦         মা  ◦        থা  য়্‌

   ১´            ২          ৩          ১´             ২          ৩
I সা -পা পা ।  পা -া ।  পা -দা I   ণা দণা ণা ।  দা -া ।  পা -া I
  জা  ন্‌ বো    রু  ◦    দ্রে  র্‌    আ  শী  ষ     ঢা  ◦    কা  ◦

   ১´              ২           ৩          ১´                 ২          ৩
I পা পাঃ -মঃ ।  পাঃ -মঃ ।  পা -ণা I  ণদা -াঃ -পঃ ।  -মা -া ।  -া -া II II
  এ  আ   ◦      ব   ◦       র  ◦      শে  ◦   ◦       ◦  ◦     ◦  ◦
```

—◦—

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

সংসার-সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহতরী,
অজ্ঞান-সলিলে ভাসে দিবস-শর্ব্বরী।
দেখ দেখ সাবধান, রিপুর সু-খর বাণ,
প্রতিক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ-লহরী।
বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার,
নিত্য সত্য নিরালম্বে অবলম্ব করি॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুর—৺বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(আস্থায়ী)

১ ২´ ৩ ০
পা II পা নধা -নর্সা র্সা। র্রা র্সা -া র্সধা। -পপা -মা পা মা। -গা -রগা া গা।
সং সা র০ ০০ সা গ রে ০ ০ ০০ ০ অ তি ০ ০০ক্ষু

১ ২´ ৩ ০
। মা পা মা -া। গা গমা -গমা -রা। -া -া -সঃ -সঃ -া। -া -া -া সা।
দ্র দে হ ০ ত রী০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
। সা গা -া মা। পা পা -া -া। -া ধা ধনা -ধনা। -পা -া -া পা।
জ্ঞা ন ০ স লি লে ০ ০ ০ ভা সে০ ০০ ০ ০ ০ দি

১ ২´ ৩ ০
। পা ধনা -র্সর্রা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -র্সধনা -পা -া -পা। -গমা -গমা -রা পা II
ব স০ ০০ শ র্ব্ব রী ০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ "সং"

(অন্তরা)

১ ২´ ৩ ০
পা II পা নধা -নর্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সা -া -া। -া -া -া র্সা।
(১) দে থ দে০ ০০ থ সা ব ০ ০ ০ ধা ০ ০ ০ ০ ন্ রি
(২) বু দ্ধি ক০ ০০ র ক র্ণ ০ ০ ০ ধা ০ ০ ০ ০ র অ

১ ২´ ৩ ০
। র্সা র্রা র্গা -র্রা। র্সা র্সা -া -া। -া -া নর্সা -র্সা। -ধঃ -নঃ -া -া পা।
(১) পু র স্থ ০ থ র ০ ০ ০ ০ বা০ ০ ০ ০ ০ ণ্ প্র
(২) না য়া সে ০ হ বে ০ ০ ০ ০ পা০ ০ ০ ০ ০ র নি

১ ২´ ৩ ০
। পা গা -মা রা। গা পা -া -া। -া ধা না -া। -নর্সা -নর্সা -পা পা।
(১) তি ক্ষ ০ পে ভ য়া ০ ০ ০ ন ক ০ ০০ ০০ ০ ত
(২) ত্য স ০ ত্য নি রা ০ ০ ০ ল ক্ষে ০ ০০ ০০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
। পা ধনা -র্সর্রা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -নর্সা -নর্সা -ধা -না। -পা -া -া পা II II
(১) র ঙ্গ০ ০০ ল হ রী ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ "সং"
(২) ব ল০ ০০ হ্ব ক রি ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

অসমীয়া গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

(আসামপর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী)

ভারতবর্ষে ছয়টী বৈষ্ণব সম্প্রদায় সবিশেষ প্রসিদ্ধ, যথা :—শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্য, রামানন্দী, বল্লভাচারী, চৈতন্যপন্থী ও মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়। দক্ষিণাপথের রামানুজাচার্য্য শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তদীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরামিষ-ভোজী। মধ্বাচার্য্য প্রথমে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের 'তুলব' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন কাণাড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ্ণুর মন্দিরে বিষ্ণুর সহিত শিব, দুর্গা ও গণেশের পূজা করেন। ইহার কারণ—দাক্ষিণাত্যের শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবগণ আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য দূর করিয়া সকলে মিলিয়া ঐরূপ প্রথা অবলম্বন করেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় বর্ত্তমানেও বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণকে লইয়া গঠিত। রামানন্দী সম্প্রদায়ের সংস্থাপকের নাম রামানন্দ। ইহাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। কবীর জনৈক মুসলমান জোলা তাঁতির পুত্র। বল্লভাচার্য্য ১৫২০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণকে রাখালবালক-ভাবে উপাসনা করেন। ধোপা, নাপিত, জেলে, মুচি, দর্জ্জি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুরা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যপন্থী-দিগের বিষয় বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র। কারণ, বাঙ্গালার অনেকেই ইহাঁদের বিষয় কিছু না কিছু অবগত আছেন।

আসামের মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রখ্যাত। শঙ্করদেব মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য মাধবদেব কর্ত্তৃক গঠিত বৈষ্ণবসম্প্রদায় "মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়" নামে আখ্যাত। এই মাধবদেব তদীয় গুরু শঙ্করদেবের ন্যায় "একশরণ-ধর্ম্ম" প্রচার করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

অন্য দেবী দেব ন করিবা সেব।
গৃহকো না যাইবা প্রসাদ না খাইবা॥
ধর্ম্ম হৈব ব্যাভিচারি।—মাধবদেব

এই মাধবদেব তাঁহার শিষ্যগণকে নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

অব্যক্ত ঈশ্বর হরি কি মতে পূজিবা তাঙ্ক
ব্যাপকত কিবা বিসর্জ্জন।
এতাবন্ত মূর্ত্তিশূন্য কোনমতে চিন্তিবাহা
রাম বুলি শুদ্ধ করাঁ মন॥—নাম-ঘোষা

প্রণিধানপূর্ব্বক কয়েকখানি অসমীয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ আলোচনার ফলে অবগত হওয়া যায় যে, মাধবদেব ব্যতীত শঙ্করদেবের দামোদরদেব ও হরিদেব নামে দুইজন প্রসিদ্ধ "শরণপ্রাপ্ত" শিষ্য ছিলেন। কোন ব্যক্তি "দীক্ষা" গ্রহণ করিলে যদি শিষ্য হয়, আর "শরণ" লইলে যদি শিষ্য না হয়, তাহা হইলে শতকরা ৯০ জন "অসমীয়া" বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে বাদ পড়ে। দক্ষিণপাট সত্রের গোস্বামী মহোদয় যে দীক্ষা দেন, সে ভিন্ন কথা। যাহা হউক—এক্ষণে আমরা এই মাধবদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য মহাপুরুষ গোপালদেবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। কেন না, বঙ্গীয় জনসাধারণ গোপালদেবী সম্প্রদায়ের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহেন।

মহাপুরুষ গোপালদেব ১৪৬১ শকে আসামপ্রদেশস্থ শিবসাগর জেলার নাজিরা নগরীর নিকটস্থ খোখোরা গ্রামে কায়স্থজাতীয় কামেশ্বর ভূঞার ঔরসে বজ্রাঙ্গীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কমলদেব ও দামোদর শিব নামে দুই পুত্র ছিল। দামোদরদেব বাল্যকালে দেহত্যাগ করেন। অল্প বয়সে গোপালের পিতৃবিয়োগ ঘটে। ইহার কিছুকাল পরে তিনি আহোমরাজ-নিগ্রহে উৎপীড়িত হইয়া আধুনিক কামরূপ জেলায় বড়পেটা অঞ্চলে চলিয়া আসেন। এখানে জানিয়া সত্রের সংস্থাপক নাপিতবংশীয় ঠাকুর আতার প্রভাবে ইনি ১৫১৮ শকে মাধবদেবের নিকট 'শরণ' লন। মাধবদেব তাঁহার জন্য একটী বাসা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মাধবদেব বৈষ্ণবধর্ম্মে 'শরণ' লইবার পূর্ব্বে মাজুলি দ্বীপস্থ আধুনিক আহতগুরি মৌজায় ধুঞাহাটা বা বেলগুরি হইতে তিন পোয়া মাইল দূরে বসবাস করিতেন। যাহা হউক—গোপাল প্রত্যহ তাঁহার সহিত নিয়মিত সময়ে কীর্ত্তনে ও ধর্ম্মালাপে যোগদান করিতেন। গোপালের কথাগুলি নিজ মতানুরূপ দেখিয়া মাধবদেব তাঁহাকে "কথার সাগর" বলিয়া ডাকিতেন। অতঃপর গোপাল ১৫১৮ শকে বরপেটা হইতে কিয়দ্দূরে ভবানীপুর নামক স্থানে একটী সত্র নির্ম্মাণ করিলে "ভবানীপুরীয়া গোপাল আতা" নামে অভিহিত হন।

ভবানীপুরীয়া গোপাল আতা ছয় জন ব্রাহ্মণ ও ছয় জন কায়স্থকে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে নিযুক্ত করেন। বর্ত্তমানে অনেক গোপালদেবী ব্রাহ্মণ সত্রাধিকারী গোস্বামী আছেন। অসমীয়া মহাভারতের কর্ণপর্ব্বের ব্রাহ্মণ কবি বিদ্যাপঞ্চানন এই কায়স্থ গোপালের শিষ্য ছিলেন :—

গুরু গোপালের পাদপদ্ম ধরি মনে।
বোলা রাম রাম ভনে বিদ্যাপঞ্চাননে॥—কর্ণপর্ব্ব

গোপাল ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালজার সত্রে লোকান্তরিত হন। তিনি তদীয় শিষ্য ছোট যদুমণিকে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে তৎপ্রতিষ্ঠিত ভবানীপুরাদি সত্রের ভারার্পণ করেন। ইহাতে গোপাল-পুত্র কমলদেব কালজার সত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক 'অপার আসামে' গিয়া একটী সত্র স্থাপন করেন। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ মাজুলি দ্বীপস্থ কলাকাটা সত্রের সংস্থাপক। এই সত্র বর্ত্তমানে নগাঁও জেলায় অবস্থিত। ছোট যদুমণির পাঁচ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে জগতানন্দ মাহরা সত্র, কমলাকান্ত আঁধার সত্র, পূর্ণানন্দ পতিঅরি সত্র, অচ্যুতানন্দ দোখরা-মুখ সত্র এবং শঙ্করী ঘাড়মরা সত্র স্থাপন করেন।

উক্ত ছোট যদুমণি ব্যতীত গোপালের নারায়ণ, বড় যদুমণি, শ্রীরাম আতা বা রামচন্দ্র এবং অনিরুদ্ধ নামে চারি জন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। নারায়ণ দহঘরিয়া সত্র স্থাপন করেন। নারায়ণের এক পুত্র সহদেব হালধি-আটি সত্র এবং আর এক পুত্র মহাদেব চকলা (৩) ও কঠলফুচি সত্রের সংস্থাপক। বড় যদুমণির তিন পুত্র ছিল; তন্মধ্যে রতিকান্ত বাঁহবাড়ী, সনাতন দিহিং এবং শ্রীকান্ত নমাটি সত্র স্থাপন করেন। শ্রীরাম আতা বা রামচন্দ্র ১৫৩৬ শকে আহতগুরি সত্র স্থাপন করেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে তদীয় চারিজন শিষ্য নাহরকাতয়া তোলোঠাকতা, কোবেথনা ও খুচুঙ্গীয়া এই চারি সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এজন্য ইহাদিগকে "আজ্ঞাপয়া সত্র" বলা যাইতে পারে। শ্রীরাম আতার পরমানন্দ ও রামানন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। পরমানন্দ নগাঁওএ করতিপার সত্র স্থাপন করিয়া সেখানে বসবাস করেন এবং রামানন্দ আহতগুরি সত্রের অধিকারী হন। এই রামানন্দ বহু বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

গোপালদেবের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য অনিরুদ্ধ মায়ামরা ও নাহরআটি সত্র স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল পোঙাগিরি বা পদ্মভূঞা। অনিরুদ্ধ ভাগবতের চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্ধের পদ রচনা করেন। তিনি উপরি-উক্ত শ্রীরাম আতার বাক্যানুসারে "পুরঞ্জয় উপাখ্যান" লিখিয়াছিলেন:—

> রামচন্দ্র গুরু হরিভক্তি সদাশয়।
> কথা করিবাক তেহোঁ বুলিলা নিশ্চয়॥
> বৈষ্ণবর বচনক করি শিরোগত।
> করিলোঁ পয়ার যেন পড়িল মনত॥
>
> —ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ।

অনিরুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম মায়ামরা বা মোয়ামরিয়া সম্প্রদায়। তাঁহার রচিত "ন-ঘোষা" পুঁথি এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক। নিম্নে ন-ঘোষা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল:—

> আদিকৃতে দেবে নানা শাস্ত্র করি হরি হরি হরি হরি এ,
> নিজ শাস্ত্রমত গুপুত করিয়া থৈলা।
> শঙ্কর রূপক ধরিয়া ঈশ্বরে হরি হরি হরি হরি এ,
> ভকতর হিত চিন্তিয়া বেকত কৈলা॥
> সেইরূপ সেহি ধর্ম্ম মাধবত হরি হরি হরি হরি এ,
> বেকত ভৈলেক দেখিলেক সর্ব্বলোক।
> এতেক অভেদ শঙ্কর মাধব হরি হরি হরি হরি এ,
> বিচার প্রমাণে ইয়াক সবে জানোকা॥
> সেই শাস্ত্রমত গোপালের মুখে হরি হরি হরি হরি এ
> অণুমাত্র ভেদ নাই শুদ্ধ রূপ দেখি।
> লোকের অভাগ্য নিমিত্ত ইদানি হরি হরি হরি হরি এ
> তাকে নিন্দা করি থাইলে যেন দুই আখি॥

উক্ত অনিরুদ্ধের কৃষ্ণানন্দ ও সর্ব্বানন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। কৃষ্ণানন্দ "পুরনিমাটি সত্র" এবং সর্ব্বানন্দের পৌত্র পীতাম্বর "দীনজয় সত্র" স্থাপন করেন। এই পীতাম্বর আহোমরাজ লক্ষ্মীসিংহের সময়ে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তৎকালে পীতাম্বরের অধীনে নাহরখোড়া নামান্তর রাঘব নামক জনৈক 'মোরাণের' ভাটুকি ও ভাকুলি নামে পত্নীদ্বয় রাধা ও রুক্মিণী নাম ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে যে শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন ভারতের ইতিহাসে তাহা বিরল। পীতাম্বর আহোম-রাজকে সাহায্য করায় পুরনিমাটীর সত্রাধিকারীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ হইয়াছিল। সেই বিরোধের ফলে পুরনিমাটী ও দীনজয় সত্রের গোস্বামীগণের মধ্যে অদ্যাবধি প্রীতিভাব নাই—এমন কি, এক সত্রের শিষ্য-গণও অন্য সত্রে যান না। পুরণীমাটী সত্রের বর্ত্তমান অধিকারীর নাম শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামী। যোড়-হাট হইতে এই সত্র সাত মাইল দূরে অবস্থিত।

মায়ামরা সম্প্রদায় গোপালদেবী সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—কেবল নামমাত্র সম্বন্ধ আছে। বিভিন্ন-জাতীয় পক্ষিগণ যেমন একই সরোবরে বিচরণ করিলেও কেহ কাহারও দলে মিশিতে ভালবাসে না, মায়ামরা সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ তেমনি মহাপুরুষ গোপালদেবকে তাঁহাদের আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও গোপালদেবী সম্প্রদায়ের শিষ্যগণের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। মায়ামরা সম্প্রদায়ের গোস্বামীগণ পূর্ব্বে বিশুদ্ধ কায়স্থ ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, বর্ত্তমানে উহাঁরা 'মোরাণ' জাতির কন্যা বিবাহ করেন। দীনজয় মায়ামরা সম্প্র-দায়ের বর্ত্তমান গোস্বামী প্রভুর নাম শ্রীযুক্ত রুদ্ররামচন্দ্র গোস্বামী। এই সত্রের প্রধান 'নামঘরে' (সংকীর্ত্তন ঘরে) 'নদীয়াল' জাতির লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়

(৩) চকলা—বর্ত্তমানে এই সত্র আহতগুরি মৌজায় যাদোয়া-আটী গ্রামে অবস্থিত।

না। মায়ামরা সম্প্রদায়ের লোকেরা গোঁড়া মহাপুরুষীয়া—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর প্রতি তাঁহারা বীতানুরাগ।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি, এইচ-ডি কৃত অনুবাদ)

সাংখ্যদর্শন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে? সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ, আপামর-সাধারণের ধারণা এইরূপ যে সাংখ্য নিরীশ্বর (অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না); এবং ইহা যে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার বিশিষ্ট প্রমাণ দেয় না তাহা নয়, ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করে। এই ধারণাটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাংখ্যের কতকগুলি সূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সেই সূত্রগুলির অর্থের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া কেবল উপর হইতে দেখিলে মনে হয় যে, বাস্তবিকই যেন সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করিতেছে; এবং এই ধারণা আরও দৃঢ়ীকৃত হয় যখন আমরা দেখিতে পাই যে, সমগ্র সাংখ্যদর্শনে কোনও বিষয়ই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। আমরা এখন দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, সাংখ্য সম্বন্ধে এই নিরীশ্বর ধারণাটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; ইহা ঐ সাংখ্যসূত্রগুলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত—নতুবা সাংখ্যদর্শন বেদান্তদর্শনের ন্যায়ই সেশ্বর।

যে সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া সাংখ্যের নিরীশ্বর ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে সেগুলি এই:—

ক—(১) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। (২) মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। (৩) উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। (৪) মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। (৫) তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং, মণিবৎ। (৬) বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাম্। (৭) সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ। (৮) অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্। (সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রম্, প্রথম অধ্যায়, সূঃ ৯২—৯৯)। উপরিউক্ত সূত্রগুলির সহিত এই সূত্রগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে:—

খ—(৯) নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। (১০) স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ। (১১) লৌকিকেশ্বরবদিতরথা। (১২) পারিভাষিকো বা। (১৩) তস্মোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ। (১৪) প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। (১৫) সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্। (১৬) প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। (১৭) সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। (১৮) শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য। (সাং, প্র, সূ,—৫ম অধ্যায়, সূঃ ২—১২)। এখন একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ এই সূত্রগুলি অথবা ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলিও সাংখ্যসম্বন্ধে নিরীশ্বর ধারণার পরিপোষকতা করে কি বিপরীত মতেরই পরিপোষকতা করে।

ক—(১) "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ "ঈশ্বরের অসিদ্ধি (অপ্রমাণ) হেতু", অথবা আরও বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়—"প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা যদি ঈশ্বর প্রমাণিত নাই হন, তাহা হইলে উহাতে কোনও দোষ হয় না। যেহেতু, ঈশ্বর প্রমাণের (প্রত্যক্ষপ্রমাণের) বিষয়ীভূত নহেন"। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না অথবা অন্ততঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ হয় না, তাঁহারা এই সূত্রটীর উপরেই অধিক জোর দেন। সুতরাং, এই সূত্রটীকেই উপরিউক্ত সব সূত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রটীর এইরূপ অর্থ করেন—

"ঈশ্বরে প্রমাণাভাবান্ন দোষ ইত্যনুবর্ত্ততে" অর্থাৎ "ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায়, ইহাতে কোনও দোষ নাই, ৯০ সূত্র হইতে শেষের এই দুইটী কথা আসিয়া বর্ত্তমান সূত্রের অর্থকে সম্পূর্ণ করিয়াছে"। তিনি আরও বলেন যে—"অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ একদেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনেবেতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। অন্যথা হীশ্বরাভাবাদিত্যেবোচ্যেত", অর্থাৎ "পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ঈশ্বরের এই নাস্তিত্ব কেবলমাত্র একদল লোকের মতেরই অনুযায়ী। তাঁহারা বিপক্ষদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই এইরূপ বলিয়াছেন। কারণ, যদি তাহা না হইত তাহা হইলে এই সূত্রটীর আকার এইরূপ হইত—"ঈশ্বরাভাবাৎ", অর্থাৎ "ঈশ্বরের নাস্তিত্ব হেতু" (এবং যেরূপ এখানে আছে যে ঈশ্বরের প্রমাণের নাস্তিত্ব হেতু—এরূপ হইত না)।" অনিরুদ্ধ ভট্টও ইহার অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যদীশ্বরসিদ্ধৌ প্রমাণমস্তি, তদা তৎপ্রত্যক্ষচিন্তা উপপদ্যতে। তদেব তু নাস্তি।" অর্থাৎ "যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষীকরণের চিন্তা যথার্থই উদিত হয়। কিন্তু তাহাই ত নাই"। সুতরাং এই দুইজন ভাষ্যকারেরই মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন না। অতএব উভয়েরই মতে যদিও উপরিউক্ত সূত্রটী দৃঢ়রূপে নাস্তিকতার (atheism) সমর্থন করে না, তথাপি ইহা অন্ততঃ

অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) সমর্থন করে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাই কৌতূহলের বিষয় যে, এই সূত্রটী ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ অস্বীকার করে তাহা ইহাদের কেহই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন না। সাংখ্য তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন, তাহার মধ্যে আপ্তবচন একটী; এবং ইহা এই বলিতেছে যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানসিদ্ধ নয়, তাহা আপ্তবচন-সিদ্ধ। (সাংখ্য-কারিকার ষষ্ঠ শ্লোক দেখ)। ইহা সুবিদিত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্রুতিসিদ্ধ; সুতরাং সাংখ্য যখন বলিতেছেন যে, ঈশ্বরাস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই, তখন ইহা নিশ্চয়ই অন্য কোনও প্রমাণের কথা বলিতেছে। সেই প্রমাণটী কি? আমরা যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে উপরি-উক্ত সূত্রটীর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধটী (context) অনুধাবন করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইবার নয়, কেবল মাত্র ইহাই দেখাইবার জন্য সূত্রটী আসিয়াছে বা উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজেই বলিতেছেন যে,—"নমু তথাপীশ্বরপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিঃ তস্য নিত্যত্বেন সন্নিকর্ষা-জন্যত্বাৎ", অর্থাৎ "কিন্তু, তথাপি (পূর্ব্বপক্ষী এইরূপ বলিতে পারেন) এই লক্ষণটী যোগী প্রভৃতিদের ঈশ্বর-প্রত্যক্ষীকরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; কারণ, অন্ততঃ নিত্য হওয়াতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষের দ্বারা উদ্ভূত নহে"—পূর্ব্বপক্ষের এই অভিযোগের উত্তরস্বরূপই উক্ত সূত্রটী এখানে আসিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সাধারণতঃ প্রমাণের অস্বীকার করা হইতেছে তাহা নহে, তবে তাঁহার সম্বন্ধে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণই অস্বীকৃত হইতেছে; এবং ইহাও ধ্রুব সত্য যে ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত বলিয়া তাঁহাকে আমরা আমাদের এই স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সুতরাং উপরি-উক্ত সূত্রটীর যথার্থ অর্থ হইবে—"ঈশ্বরস্য অসিদ্ধেঃ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবাৎ", অর্থাৎ "ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাবের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-প্রমাণ না থাকা হেতু"। যদিও বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার নিজের ভ্রান্ত অর্থের পরিণাম এড়াইবার জন্য বলিয়াছেন যে, এই সূত্র ঈশ্বরের নাস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের নাস্তিত্বই স্বীকার করিতেছে; তথাপি এই দুইটী বাক্যার্থ কার্য্যতঃ একই, অথবা আমি যেরূপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ নাস্তিকতার সমর্থন না হইলেও অজ্ঞেয়বাদের সমর্থন হয়।

বিজ্ঞানভিক্ষুর অর্থ যে ভ্রান্ত তাহা অন্য দুইটী সূত্রের সঙ্গে তুলনা করিলেই আরও পরিষ্কাররূপে দেখান যাইতে পারে। যে সূত্র দুইটী এই—(১) "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং, মণিবৎ" অর্থাৎ "অয়স্কান্ত মণির ন্যায় প্রকৃতির সাভিপ্রায় সৃষ্টিকার্য্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য হেতুই সংঘটিত হয়"; এবং (২) "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বং" অর্থাৎ "লোকের পক্ষে যেরূপ অন্তঃকরণের পক্ষেও সেইরূপ। ঈশ্বরের দ্বারা সচেতন হয় বলিয়া বস্তুর এই সৃষ্টিশক্তি অন্তঃকরণেরই"। এই দুইটী সূত্রেই আমরা 'তৎ' এই কথাটী দেখিতে পাই। ইহার প্রকৃত অর্থ কি? অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই বলেন যে, ইহা দ্বারা পুরুষ অর্থাৎ সসীম জীবাত্মাকেই বুঝা যায়। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে ইহা ঈশ্বরকেই বুঝায়, জীবাত্মাকে আদৌ বুঝায় না। সূত্রকার ৯৩ সূত্রে প্রথম ঈশ্বরের বিষয় বলেন, এবং পরবর্ত্তী অন্য সূত্রগুলিও ঐ একই বিষয়ের হইবে, কারণ ইহার কোনটীতেও জীবাত্মার বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা যদি উপরি-উক্ত সূত্রগুলির প্রত্যেকটীকে অপর বাকী সূত্রগুলির সঙ্গে পাঠ করি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে, ৯৬ ও ৯৮ সূত্রে যে 'তৎ' কথাটী আছে তাহা ৯৩ সূত্রের 'তৎ' কথাটীর ন্যায় অবশ্য সেই ঈশ্বরকেই বুঝাইবে, যাহা ৯২ সূত্রেও আছে। অধিকন্তু, এই ব্যাখ্যাটীর যাথার্থ্য আরও দৃঢ়ীভূত হয়, যখন আমরা ইহাকে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে 'বশিষ্ঠ ও জনক' এবং 'যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের' কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত সাংখ্যমত ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করি।

(২) "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ", অর্থাৎ "এই জগতে মুক্ত অথবা বদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অপর কোনও প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ নাই; অতএব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে।" বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার অর্থ ভিন্নরূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঈশ্বর দুঃখের দ্বারা বদ্ধও হইতে পারেন না এবং তাহা হইতে মুক্তও হইতে পারেন না, অথবা তিনি অন্য কোনও প্রকার ধর্ম্মী হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। অনিরুদ্ধ ভট্টও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা "ঈশ্বর অন্য কোনওরূপ ধর্ম্মী হইতে পারেন না" ইহার দ্বারা কি বুঝেন? ঈশ্বর কি নিত্যমুক্ত নন, এবং সুতরাং ভিন্নধর্ম্মী? ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে এই যে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্নধর্ম্মী কোনও জিনিস থাকিতে পারে না; কারণ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ (জীবাত্মা) হয় বদ্ধ অথবা মুক্ত। সুতরাং উপরি-উক্ত সূত্র এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়গোচর প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে এবং কেবলমাত্র এই অর্থই পূর্ব্ব সূত্রের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং এই সূত্রটী আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তটীকেই সমর্থন করিতেছে।

(৩) "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্", অর্থাৎ "বিশেষ লিঙ্গযুক্ত প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ মাত্রই যখন মুক্ত অথবা বদ্ধ জীব-সংজ্ঞাভুক্ত, তখন কাজেই ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহেন"। এই সূত্রটীর অর্থ আর পূর্ব্ব সূত্রের অর্থ একই। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মতে 'অসৎকরত্বম্'এর অর্থ 'অক্ষমত্বম', অর্থাৎ কোনও জিনিস উৎপন্ন করিতে অক্ষমতা। কিন্তু ইহা বুঝা কঠিন যে, এই অর্থ কিরূপে হইতে পারে! ইহার অর্থ হওয়া উচিত 'অসিদ্ধত্বম্' অর্থাৎ 'প্রমাণাভাব,' এবং কেবল এই অর্থই পূর্ব্ব সূত্রের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। এখানে সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনওরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ইহার অর্থ পূর্ব্ব সূত্রের অর্থের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং হঠাৎ অপর একটী নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করিবে। অনিরুদ্ধ ভট্টও বলেন যে এই সূত্রটীও পূর্ব্ব সূত্রটীর ন্যায় একই বিষয় বুঝাইতেছে।

(৪) "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা" অর্থাৎ "(ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল) হয় মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাবাচক অথবা সিদ্ধপুরুষদের উপাসনাপর, (বিজ্ঞান-ভিক্ষু); পক্ষান্তরে হয় মুক্তবৎ পুরুষদের অথবা যোগদ্বারা সিদ্ধ পুরুষের প্রশংসাসূচক"। এই সূত্রটী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরস্বরূপই প্রযুক্ত হইয়াছে; শ্রুতি-স্মৃতি ও পুরাণের বহু জায়গায় এরূপ গল্প সকল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে বলা হইয়াছে যে ভক্ত ও যোগীরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া প্রশংসা-বাক্যসকল উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন; এবং আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য অবতীর্ণ মূর্ত্তির উপাসনাও হইয়াছে। ঈশ্বর যদি প্রকৃতই প্রত্যক্ষের বিষয় না হন, তাহা হইলে এ সব কি করিয়া সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে ইহা বুঝায় না যে ঈশ্বর বলিয়া কোনও বস্তু নাই, কিন্তু শুদ্ধ ঈশ্বর বলিতে এখানে বুঝাইতেছে মুক্তপুরুষদের অথবা যাঁহারা যোগদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা সিদ্ধিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ায় ঈশ্বরস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং উপরি-উক্ত সূত্রটী ঐ সকল কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না—এই মতের কোনও বিরুদ্ধাচরণ করে না। পরন্তু এখানে এই কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত সূত্রটী শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির যে সকল স্থানে প্রকৃত ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে সেই সকল স্থানের সত্যতা অস্বীকার করিতেছে না। (ক্রমশঃ)

আরো দুঃখ।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়)

যা' কিছু স্নেহের ধন ছিল রে আমার
একে একে চলে' গেল চক্ষের সম্মুখে—
কাল না হইতে পূর্ণ; আমিঃভগ্নবুকে
তবু—তবু বেঁচে আছি! বুঝি' অনিবার
প্রতিকূল ভাগ্য সনে দুই মুষ্টি তরে।
সকলি কাড়িয়া যবে নিয়েছ নির্দ্দয়,
ক্ষুধাটুকু তবু কেন রেখেছ উদরে?
বুঝিতে পারি না তুমি কিসে দয়াময়!
না—না তুমি দয়াময়—করুণানিধান।
আমিই পাতকী ঘোর—নিজ কর্ম্ম ফলে
ভুঞ্জিতেছি এত দুঃখ এই ধরাতলে।
এ যে মোর প্রায়শ্চিত্ত—ন্যায়ের বিধান!
সহিতেছি এত তবু হই নাই সিধে—
দাও প্রভু, আরো দুঃখ দাও বিঁধে বিঁধে!

পার্শ্বনাথ-চরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-এ)

এইরূপ চিন্তা করিয়া পার্শ্বনাথ দ্বাদশানুপ্রেক্ষার * ভাবনা করিতে লাগিলেন। এই সময় পঞ্চম স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া তাঁহার উপর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—'ধন্য প্রভু, আপনি ধন্য! আপনি চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আজ আপনি বৈরাগ্যরূপ খড়্গ হাতে লইয়া মোহরূপ শত্রু নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। সমস্ত জগৎ মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। আপনার উপদেশরূপ দিব্যধ্বনি শুনিতে পাইলেই উহা জাগরিত হইয়া উঠিবে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ—অতএব, এ সকলই আপনি জানেন। আপনিই সকলকে উপদেশ দিতে সমর্থ। আপনাকে উপদেশ দিতে পারে এরূপ সামার্থ্য কাহারও নাই। তীর্থঙ্করের বৈরাগ্যের সময় আমাদের আসিবার নিয়ম আছে। তাই আমরা আসিয়া প্রার্থনা করিতেছি—আপনি মুনিদিগের মহাব্রত ধারণ করিয়া সত্বর কর্ম্মরূপ শত্রুকে সংহার করুন—ভ্রমরূপ অন্ধকার আপনি দূর করুন; তাহা হইলে জগতের সকল জীব মুক্তির মার্গ চিনিতে পারিবে।' এই বলিয়া পার্শ্বনাথের

* অনিত্যত্ব, অশরণত্ব, সংসার, একত্ব, অন্যত্ব, অশুচিত্ব, আস্রব, সংবর, নির্জ্জরা, লোক, বোধিদুর্লভত্ব ও ধর্ম্মস্বাখ্যাতত্ব—এই দ্বাদশ বিষয়ের চিন্তার নাম দ্বাদশ অনুপ্রেক্ষা। এই বিষয়গুলির চিন্তা করিলে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্ম্মে আস্থা জন্মিয়া থাকে।

চরণে বারংবার নমস্কার করিয়া তাহারা নিজ নিজ স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার পর চারিজন ইন্দ্র নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া সানন্দে সপরিবারে পার্শ্বনাথের 'দীক্ষাকল্যাণক' উৎসব সম্পন্ন করিতে আসিলেন। নানাপ্রকারের বাদ্য বাজিতে লাগিল—দেবাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন—কিন্নরীগণ মধুরস্বরে গান গাহিতে লাগিল এবং সমস্ত দেবগণ জয়জয় করিতে লাগিলেন। ক্ষীরসমুদ্রের জলে ভরা সোনার কলসের জল দ্বারা সৌধর্ম্মেন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট পার্শ্বনাথের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তারপর, তাঁহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করাইয়া তাঁহার শরীর চন্দন-চর্চ্চিত করিলেন।

তখন পার্শ্বনাথ নিজ মাতা পিতা, কুটুম্ব এবং উপস্থিত জনগণকে বৈরাগ্যবিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহা শুনিয়া রাণী বামাদেবীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। পার্শ্বনাথ তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া শান্ত করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক আনীত 'বিমনা' নামক পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। প্রথমে পৃথিবীর রাজগণ ঐ পাল্কী কাঁধে লইয়া সাত পা চলিলেন। তাহার পর, বিদ্যাধর রাজারা উহা লইয়া আর সাত পা গেলেন। অবশেষে, ইন্দ্রাদি দেবগণ উহাকে কাঁধে করিয়া 'অশ্ব' নামক বনে লইয়া গেলেন। সেই বনমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে একখানি স্বচ্ছ শিলাখণ্ডের উপর ইন্দ্রাণী আলিপনা আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ যাইয়া সেই শিলার উপর বসিলেন। তখন সমস্ত কোলাহল শান্ত হইয়া গেল। পার্শ্বনাথ সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। সম্পূর্ণরূপ নগ্ন অবস্থায় উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া যুক্তকরে সিদ্ধ পরমেষ্ঠীকে নমস্কার করিলেন। তারপর বাহ্য ও অভ্যন্তর সমস্ত পরিগ্রহ * ত্যাগ করিয়া পাঁচ মুষ্টিতে সমস্ত কেশ ও শ্মশ্রু উন্মূলিত করিলেন। † এই প্রকারে পৌষমাসের শুক্লা একাদশীর দিন, দিবসের প্রথম প্রহরে তিনি মহাব্রত ধারণ করিলেন এবং ধ্যান করিবার জন্য পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য তিন শত রাজাও দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাঁহার লুঞ্চিত কেশ ইন্দ্র স্বয়ং লইয়া গেলেন এবং উহা ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর পার্শ্বনাথ তিন দিন উপবাস করিলেন। তিনি মুনিদিগের পালনীয় আচারসমূহ যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন এবং মৌনাবস্থায় ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি 'মনঃপর্য্যয়' জ্ঞানলাভ করিলেন।

ধ্যান সমাপ্ত হইলে তিনি গুল্মখেট নামক নগরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে যাইবার সময় যাহাতে পদাঘাতে প্রাণিহত্যা না হয় তিনি সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। নগরে পৌছিলে সেখানকার রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং নমস্কার করিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। 'প্রাসুক' জলে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। তাহার পর শুদ্ধভাবে তাঁহাকে আহার প্রদান করিলেন। এইরূপ উত্তম ব্যক্তিকে যথাবিধি ভক্তির সহিত আহার প্রদান করায় ব্রহ্মদত্তের প্রাসাদে দেবগণ 'পঞ্চাশ্চর্য্য' বৃষ্টি করিলেন।

ইহার পর পার্শ্বনাথ পুনরায় বনমধ্যে আসিলেন এবং ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার একাগ্র ধ্যানের মাহাত্ম্যে বনের সমস্ত পশু বৈরভাব ত্যাগ করিয়া প্রীতির সহিত খেলা করিতে লাগিল। সেখানে সিংহ পশুহিংসা ত্যাগ করিল—সর্প দংশন হইতে বিরত হইল এবং সকলেই শান্তভাব ধারণ করিল।

একদিন পার্শ্বনাথ বনমধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেই সময় কমঠের জীবাত্মা—যে জ্যোতিষী শম্বর দেব-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—সেই শম্বর বিমানে করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। যাইতে যাইতে বিমান দণ্ডায়মান পার্শ্বনাথের মাথায় ঠেকিল। শম্বর অবধিজ্ঞানের বলে জানিতে পারিল যে তাহারই পূর্ব্বজন্মের শত্রু সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া নানারূপে পার্শ্বনাথের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার প্রভাবে চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, মেঘ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—পৃথিবী জলে ভাসিয়া গেল—প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল—গাছপালা পড়িতে লাগিল—পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থানচ্যুত হইল। কিন্তু পার্শ্বনাথ যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। শত চেষ্টায়ও শম্বর তাঁহার তপস্যার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিল না।

কিন্তু সে কিছুতেই নিরস্ত হইল না। পার্শ্বনাথের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য সে আরও অত্যাচার আরম্ভ করিল। যমরাজের ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—মুখে কালি মাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল—গলায় মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে

* ক্ষেত্র, বাস্তু, ধন, ধান্য, দ্বিপদ-চতুষ্পদগণ, শয্যা, আসন, ভাণ্ড ও বস্ত্রাদি এই দশটী বাহ্য পরিগ্রহ এবং মিথ্যাত্ব, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, হাস্য, রতি, অরতি, শোক, ভয়, জুগুপ্সা, কামবেদনা, রাগ, দ্বেষ এই চতুর্দ্দশটী আভ্যন্তর পরিগ্রহ।

† জৈনমুনির ক্ষুর দ্বারা কেশচ্ছেদনও বিধেয় নহে। তাই তাহারা উহা হস্ত দ্বারা উৎপাটিত করিয়া থাকেন।

লাগিল—মোটা গলায় 'মার মার' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; এই রকম নানা উপায়ে সে পার্শ্বনাথের মনে ভীতি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পার্শ্বনাথ নির্ভীকচিত্তে অটল অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই সময় পাতালে ধরণেন্দ্রের আসন কম্পিত হইল। অবধিজ্ঞানের বলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, যে পার্শ্বনাথ পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন আজ সেই পার্শ্বনাথের উপর অত্যাচার করা হইতেছে। ইহা জানিতে পারিয়াই তিনি সত্বর পদ্মাবতীকে লইয়া পার্শ্বনাথের নিকট চলিয়া আসিলেন এবং দুইজনে হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর, প্রবল বেগে পার্শ্বনাথের মাথার উপর বৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া তিনি এমনভাবে তাঁহার মাথার উপর ফণা বিস্তার করিলেন যে, তাঁহার মাথায় আর এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়িতে পারিল না। * এই সকল দেখিয়া শম্বর অতিশয় ভীত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

এইরূপে তপস্যার ফলে কেবল জ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইলে ত্রিভুবনের সমস্ত বিষয়ই পার্শ্বনাথের নিকট সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অতঃপর, স্বয়ম্ভু-নামক 'গণধর' † পার্শ্বনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'প্রভো! যে সকল জীব অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদের সে অজ্ঞান নষ্ট করিয়া দিন।' তখন যাহাতে জীবমাত্রেই বুঝিতে পারে পার্শ্বনাথ এরূপ ভাবে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে প্রশ্ন করিল, তিনি দিব্যধ্বনি সহকারে তাহাদের সকলেরই সুমীমাংসা করিয়া দিলেন। তাঁহার সেই মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া কত শত মনুষ্য দিগম্বর মুনির দীক্ষা গ্রহণ করিল—কতশত পশু পর্য্যন্ত শ্রাবকের আচরণীয় ব্রত ধারণ করিল—কত শত স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত 'অর্য্যিকার' বা সন্ন্যাসিনীর ব্রত ধারণ করিয়া পতির সহিত বনে যাত্রা করিলেন।

কমঠের জীব শম্বরও এই সময় সেইখানে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেও পার্শ্বনাথের সেই মনোহর উপদেশ শুনিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইল। সেই বনে অন্য মতাবলম্বী সাতশত মুনি তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহারাও জিনেন্দ্র পার্শ্বনাথের সমবশরণ * বিভূতি দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপদেশকেই সত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার উপদেশ মত সংযম ধারণ করিলেন ও নিজের পূর্ব্ব আচরণসমূহ পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার পর ইন্দ্র দাঁড়াইয়া বলিলেন—'ভগবন্, আপনি নানাস্থানের লোকের উপকারের জন্য বিহার করিতে (ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপদেশ দিতে) আরম্ভ করুন।' ইহা শুনিয়া পার্শ্বনাথ সে স্থান ত্যাগ করিয়া বিহারার্থ বহির্গত হইলেন। কাশী, কোশল, পাঞ্চাল, মহারাষ্ট্র, মগধ, অবন্তী, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় সত্তর বৎসর যাবৎ বিহার করিয়া পার্শ্বনাথ অবশেষে সম্মেদশিখর বা পরেশনাথ পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একমাস যাবৎ ধ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি মোক্ষলাভ করিলেন। তাঁহার সহিত ছত্রিশ জন অপর মুনিও মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

তখন স্বর্গ হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া সে পবিত্র দেহ সুগন্ধি দ্রব্যের সংযোগে দগ্ধ করিলেন। তাহার পর, সেই পবিত্র দেহভস্ম দেবগণ অঙ্গে মাখিয়া আনন্দ করিতে করিতে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাগ-বিবোধ।

(সোমেশ্বর-কৃত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(পণ্ডিত ৺ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত)

পস্তু ত্রয়োদশীস্থঃ ষোড়শ্যষ্টাদশীস্থিতৌ চ ধনী।
দ্বাবিংশীস্থঃ ষড়্জোদ্বিগুণসমঃ পূর্ব্বষড়্জেন। ২১

প ত্রয়োদশীস্থ; ধ, নি ষোড়শী ও অষ্টাদশীস্থ; ষড়্জ দ্বাবিংশীস্থ, ইহা পূর্ব্ব ষড়্জের সহিত দ্বিগুণসম। ২১

প অর্থাৎ পঞ্চম ত্রয়োদশীস্থ অর্থাৎ ত্রয়োদশীতে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ধ ষোড়শীতে ও নি অষ্টাদশীতে স্থিত ষড়্জ দ্বাবিংশীস্থ। এস্থলে ষড়্জকে মধ্যমস্থানস্থ ষড়্জ বুঝিতে হইবে। কিরূপ? পূর্ব্ব ষড়্জের সহিত অর্থাৎ মেরুতন্ত্রীস্থ মন্দ্র ষড়্জের সহিত দ্বিগুণ ও সম অর্থাৎ দ্বিগুণ প্রযত্নসাধ্য হইলেও সমধ্বনি হইবে। যেমন দেবদত্ত নিম্নস্থল হইতে উচ্চ স্থলগত হইলেও সেই দেবদত্ত এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় এস্থলে সেইরূপ বুঝিও। ২১

---

* পার্শ্বনাথের বহু মূর্ত্তির উপর সর্প-ফণা-নির্ম্মিত ছত্র দেখা যায়; এবং এখনও পার্শ্বনাথের প্রতিমার উপর এইরূপ ছত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

† তীর্থঙ্করের শিষ্যগণ গণধর নামে আখ্যাত হন। ইঁহারা তীর্থঙ্করের উপদেশাবলী জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

* তীর্থঙ্করের উপদেশ-সভার নাম 'সমবশরণ'। সমবশরণসভায় স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্ত উপদেশ শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়া থাকেন।

ধ্বনিশুদ্ধিনিশ্চয়ার্থং বিকৃতনার্থং চ সশ্চতুশ্রুতিকঃ।
পুনরুক্ত ইতি মতং মে শ্রুতিস্বরাবগমনায় লঘু। ২২

ধ্বনি-শুদ্ধি-নিশ্চয় জন্য এবং বিকৃত নিষাদের জন্য চতুঃশ্রুতি ষড়্জ পুনরুক্ত। শ্রুতিস্বরের অবগমনের নিমিত্ত আমার এই সংক্ষিপ্ত মত। ২২

দেহস্থ শ্রুতি স্বরের সহিত মিল হইবার জন্য, বীণাতে দ্বাবিংশতিসংখ্য শ্রুতিপদ দ্বারা স্বরাভিব্যক্তি হয় এই বলাই সঙ্গত, ষড়্বিংশতিসংখ্যা ঠিক নয়; এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, সেই চতুঃশ্রুতি ষড়্জ পুনরুক্ত। কি জন্য? ধ্বনি অর্থাৎ তন্ত্রী-মেরু-সারী-সংযোগ-জনিত—যাহা শ্রুতি নামে নির্দ্দিষ্ট—সেই সমস্ত ধ্বনির শুদ্ধিনিশ্চয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ স্থাপন শুদ্ধ হইল কি না এই প্রত্যয়ের নিমিত্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থাপনা দ্বারা মধ্যষড়্জের সহিত মেরুস্থ মন্দ্র ষড়্জের যে মিল তাহা শুদ্ধ হইয়াছে এই নিশ্চয়-জ্ঞান চতুঃশ্রুতি ষড়্জ ব্যতীত সম্ভব হয় না। আরও বিকৃত অর্থাৎ শুদ্ধ হইতে অন্য বক্ষ্যমাণ যে নিষাদ তজ্জন্যও বটে। অর্থাৎ ষড়্জের পুনর্ব্বার শ্রুতিকথন ব্যতীত, ষড়্জাদির একশ্রুতি অবলম্বন দ্বারা বক্ষ্যমাণ নিষাদের কৈশিকীত্ব, ও উহার শ্রুতিদ্বয় অবলম্বন দ্বারা কাকলীত্ব সংবাদের জন্য অর্থাৎ মিলের জন্য উপপন্ন হইবে না, এই ইহার ভাব। শ্রুতিস্বরের যে অবগমন অর্থাৎ মিল হইল কি না এই প্রত্যয় তদ্বিষয়ে আমার এই মত। কিন্তু ইহা লঘু অর্থাৎ বিস্তারভয়ে সংক্ষিপ্ত। আমি বিস্তারভয়ে বীণাদ্বয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সারণা দ্বারা স্বরসমূহে স্বরান্তর প্রবেশ কহিলাম না, কিন্তু স্ববুদ্ধিবলে উপায়মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম। ২২

ইতিসপ্তোক্তাঃ শুদ্ধা বিকৃতান্ সপ্তৈব বচ্মি সহ নাম্না।
সাধারণোন্তরশ্চ শ্রুতিং শ্রুতী চেত্য গো মস্য। ২৩

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সাতটী স্বর কথিত হইয়াছে তাহা শুদ্ধ। বিকৃত সাতটীও নামের সহিত কহিতেছি। ম-এর শ্রুতি ও শ্রুতিদ্বয়কে পাইয়া গ সাধারণ ও অন্তর হয়।

এখন পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিব্যবস্থাপক স্বরসপ্তক উল্লেখ করিয়া তৎসমূহের শুদ্ধতা বিধান করা হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত যে সাতটী তৎসমুদায় শুদ্ধ জানিও। পরে বিকৃত সাতটীও নামের সহিত নিরূপিত হইতেছে। সাতটীই নামের সহিত কহিতেছি। গান্ধার ও নিষাদের দুই প্রকারে বিকৃততা দেখাইয়া শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ ও পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা দুই দুই নাম কহিতেছেন। ম-এর একটী শ্রুতি ও দুইটী শ্রুতি পাইয়া গ ক্রমে সাধারণ ও অন্তর হয়। গান্ধার মধ্যমের প্রথম শ্রুতিতে অর্থাৎ আদি হইতে দশম শ্রুতিতে—থাকিয়া সাধারণ নাম হয়। আ১ গান্ধারই মধ্যমের ম-এর দ্বিতীয় শ্রুতিতে—আদি হইতে একাদশ শ্রুতিতে থাকিয়া—অন্তর-নাম হয়। ২৩

নিঃ কৈশিকী চ কাকল্যথ সপৈ্যকাং ভজংশ্চ তাং
তে দ্বে।
নিগমা মৃদুপরসমপাঃ সমপতৃতীয়শ্রুতিস্থিতা। ২৪

স-এর সেই এক, সেই দুই শ্রুতিকে ভজনা করিয়া নি কৈশিকী ও কাকলী হয়। নি-গ-ম স-ম-প-এর তৃতীয় শ্রুতিতে অবস্থিতি দ্বারা মৃদুপর স-ম-প হইয়া থাকে। ২৪

ষড়্জের সেই এক, সেই দুই শ্রুতি অবলম্বনে ক্রমে নি কৈশিকী ও কাকলী হয়। নিষাদ ষড়্জের প্রথম শ্রুতিতে থাকিয়া কৈশিকী হয়। আর নিষাদই ষড়্জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে থাকিয়া কাকলী হইয়া থাকে। এক্ষণে নিষাদ ও গান্ধারের তৃতীয়, আর মধ্যমের প্রথম বিকৃতত্ব লক্ষ্য করিয়া এক এক নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন। নিষাদ গান্ধার ও মধ্যম, ইহারা ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চমের যে সকল তৃতীয় শ্রুতি, তৎসমূহে যে স্থিতি অর্থাৎ স্ফুটতা তদ্দ্বারা মৃদু স-ম-প তাহা হইয়া থাকে। নিষাদ নিজের দ্বিতীয় শ্রুতি ত্যাগ করিয়া যখন ষড়্জের তৃতীয় শ্রুতিতে থাকে তখন তাহা মৃদু স-নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ গান্ধার নিজের দ্বিতীয় শ্রুতি ত্যাগ করিয়া যখন মধ্যমের তৃতীয় কিম্বা আদি হইতে দ্বাদশীতে থাকে তখন তাহা মৃদু ম-নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। আর মধ্যম নিজের চতুর্থী ত্যাগ করিয়া যখন পঞ্চমের তৃতীয় কিম্বা আদি হইতে ষোড়শীতে থাকে তখন মৃদু প-নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। যদ্যপি প্রাচীনেরা স্বস্ব চতুর্থ শ্রুতি ত্যাগে স্বস্ব তৃতীয় শ্রুতিস্থ ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চমেরই বিকৃতত্ব কহিয়াছেন, তথাপি দেশী গীতে ষড়্জ ও পঞ্চমের স্বস্ব চতুর্থ শ্রুতিত্যাগের অদর্শন হেতু, এবং স্বস্ব তৃতীয় শ্রুতিস্থ যে ষড়্জ মধ্যম ও পঞ্চম, দেশী-গীতে তাহাদেরই নিষাদ গান্ধার ও মধ্যম-রূপে ব্যবহার দর্শন হেতু নি গ ও ম-এরই বিকৃতত্ব এস্থলে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন মতের ইত্যাদি প্রকার বিরোধ আছে, গ্রন্থকার স্ব-মন্তব্যের সহিত অগ্রে তাহা পরিহার করিবেন। ২৪

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন্তব্য।

[১। ন-অক্ষর প্রাণ-বোধক এবং দ-অক্ষর অগ্নি-বোধক। যেহেতু, দেহস্থ প্রাণ-বায়ু (শ্বাস-প্রশ্বাস-উৎপাদক স্নায়ু-শক্তি) ও দেহস্থ বহ্নি (তাপ কিম্বা তাড়িৎ) এই উভয়ের সংঘর্ষে নাদ অভিব্যক্ত হয়, এইজন্য ইহার নাম "নাদ" হইয়াছে;—"সঙ্গীত-রত্নাকর" নাদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না,—প্রভৃতি বায়ু-বহা নাড়িই স্নায়ু (nerve); এবং "বায়ু"—কিনা